ধর্ম জিজ্ঞাসা

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী

: পরিবেশক :

প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

৩৩ কলেজ রো

কলিকাতা

ধর্ম জিজ্ঞাসা :—

প্রথম প্রকাশ : ৩০ই মার্চ, ১৯৫৭।

প্রকাশক : শ্রীমনীষা বাগচী।

মুদ্রক : শ্রীবাসুদেব চৌধুরী।

প্রিণ্টার্স : শচীরাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, রায়গঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান :—

প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

শ্রীমতী মনীষা বাগচী
বীরনগর, রায়গঞ্জ
পশ্চিম দিনাজপুর।

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

স্পোর্টস এণ্ড বুক কর্ণার
রায়গঞ্জ
পশ্চিম দিনাজপুর।



ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগ্‌চী

প্রকাশকের নিবেদন

শক্তিদায়িনী মহামায়ার কৃপায় "ধর্ম জিজ্ঞাসা" প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। গ্রন্থকারের অসাধারণ মানসিক ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত স্বধর্মনিষ্ঠ আচার্য্য ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী মহোদয় সংক্ষেপে হলেও তাঁর প্রস্তাবনাতে লিখেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল ইচ্ছাটী কিভাবে রোপিত হয়েছিল তা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রন্থকার অনেক স্থানে নানা ধরণের সভায় আহূত হন। তার মধ্যে ধর্ম সভাও যথেষ্টই থাকে। এমনই এক ধর্ম সভায় একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় ডাঃ বাগচীর উপাস্যভেদ হয় কেন এই ভাষণ শুনে সন্ন্যাসী মহারাজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—আপনি কি এই রকমের ভাষণ আরও দেন। ডাঃ বাগচী হাঁ বলাতে তিনি বলেন আপনি এগুলি লিপিবদ্ধ করুন। কারণ আমাদের বেদান্ততত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের বক্তৃতার চেয়ে এই ধরণের বক্তৃতা গৃহস্থের পক্ষে মঙ্গলদায়ক ও সহজে অনুসরণ যোগ্য হয়। বস্তুতঃ তাঁর কথাতেই গ্রন্থকার তার ভাষণগুলি লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ভার আমাকে দিয়েছেন। জীবনে সর্ব স্তরেই তিনি আমাকে গৃহিনী সচিব সখীর মর্য্যাদা পূর্ণভাবে দিয়েছেন—তাই এই ভার আমি সানন্দে মাথা পেতে নিয়েছি।

ধর্ম সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি মানুষকে দিশাহারা করে। আস্তিক্য—নাস্তিক্য বস্তুবাদ বিজ্ঞানবাদ অধ্যাত্মবাদ বিভিন্ন যুক্তি তর্কের স্রোতে মানুষ পথহারা হয়। এই গ্রন্থে বিষয়নিরপেক্ষ সরল ভাষায় সব কিছুই উপস্থাপিত হয়েছে এই গোলক ধাঁধাঁ নিরসনের আশায়।

প্রচ্ছদে সারদা তন্ত্রোক্ত সর্বতোভদ্রমণ্ডলম যন্ত্র আঁকা হয়েছে। তন্ত্রোক্ত সকল শুভকার্য্যের আরম্ভে এই যন্ত্র আঁকা হয়। সব কিছুরই মঙ্গল হোক এই কামনায়। যন্ত্রের নামেই তা প্রকাশ।

এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন পণ্ডিত প্রবর ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়। এর জন্য তাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নাই। তিনি গ্রন্থাকারকে অন্তর দিয়ে বুঝেছেন। তাঁর পুস্তকখানিও তাঁর ভাল লেগেছে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। আমার মধ্যম জামাতা সুপণ্ডিত শ্রীমান পবিত্র ভট্টাচার্য্য বহু যত্ন সহকারে পাণ্ডুলিপি অনুলিখন করে এবং শ্লোকাংশগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাই।

শচীরাণী প্রিন্টিং প্রেসের মালিক শ্রীবাসুদেব চৌধুরী গ্রন্থখানি প্রকাশে যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন দিয়েছে। তাকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ জানাই।

ধর্ম জিজ্ঞাসু পাঠকগণ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তর এই গ্রন্থে পান তবে লেখকের একটী মনোগত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। অনেক যত্ন সত্ত্বেও যদি ভুল ত্রুটী থাকে পাঠকগণ ক্ষমা করবেন।

শ্রীমতী মনীষা বাগচী

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণতম অধ্যাপক ও গবেষণা নির্দেশক ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের এবং বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা—মহাপণ্ডিত আচার্য্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. পি. এচ্. ডি সাহিত্য ভারতী বাচস্পতি বাণীকণ্ঠ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) মহোদয়ের—

প্রস্তাবনা—

বিশাল বিশ্বস্য বিধান বীজং
বরং বরেণ্যং বিধি বিষ্ণু সর্বৈঃ
বসুন্ধরা বারি বিমান বহ্নি
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে।

ওঙ্কারনাথ দেবায় গুরবে পরমাত্মনে।
সীতারাম স্বরূপায় নাম প্রেমাত্মনে নমঃ॥
কলি কল্মষ নাশায় তন্ত্রমন্ত্র প্রদায়িনে।
পর ব্রহ্ম স্বরূপায় শিব শক্ত্যাত্মনে নমঃ॥

বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময় ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা। সনাতন হিন্দু ধর্ম বিচিত্র তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্রের দ্বারা নানা আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। "আচার প্রভবো ধর্মঃ—বাস্তব পরীক্ষিত সত্য। তত্ত্বের আশ্রয় হচ্ছে অনুষ্ঠান। আবার অনুষ্ঠানের প্রাণ হচ্ছে তত্ত্ব। চর্চাকে সার্থক করতে হয় চর্চার মাধ্যমে। তাই শাস্ত্রের উপদেশ—গুরু শিষ্যকে দীক্ষান্তে বলবেন—"উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচার বান ভব।" কাল প্রভাবে বৈদেশিক সংস্কৃতির নির্বিকার দাসত্বে অহমিকার ঔদ্ধত্যে, অনুষ্ঠানাদির অকরণে এবং অজ্ঞতার ফলে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আচরণাদি অনেকের কাছে অর্থহীন কুসংস্কার। তার তত্ত্ব তাৎপর্য এবং প্রভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনীহ এবং অনবহিত। সমাজে এবং গৃহে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাও প্রায় দেখা যায় না। তত্ত্ব এবং তাৎপর্য না জানায় গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠান পরিপালনে এসেছে

অনেক ক্ষেত্রে অশোভন বিকৃতি। অনেক সর্বজনীন পূজায় তারই ছায়াপাতে সংস্কৃতি এবং ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন। ধর্ম বিরোধীরা তাতে উল্লসিত। হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নিন্দায় পঞ্চ মুখ। হিন্দু ধর্ম যেন আজ অভিভাবকহীন নাবালক। যে যেমন ইচ্ছা তার কর্ণ মর্দন করছে। ঘরে বাইরে অনেকেই তাকে নিন্দা করে প্রগতিশীলতার মানস বিলাস চরিতার্থ করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে সংখ্যা গুরুর আশ্রয় হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রতিকূল। আত্ম সুখমগ্ন সমাজ উদাসীন, লোভে এবং ভয়ে অনেক ধর্মনেতা নীরব এবং বিদেশী ও তাঁদের অনুগামী স্বদেশীয়রা অজ্ঞতার জন্য হীনম্মন্যতায় দুর্বল। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনে স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় আমরা পরান্মুখ। এই মর্মান্তিক আত্ম বিস্মৃতি জাতীয় আত্ম হত্যার পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

এই সঙ্কটে যুগ জিজ্ঞাসায় আমাদের উত্তর দানের প্রয়াস একান্ত অপেক্ষিত। তাই মুক্ত বুদ্ধি, বহুদর্শী বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাধক মনীষী ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী আমাদের আত্ম স্মৃতি জাগরণের জন্য লেখনী ধারণ করেছেন। ফলে এই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের আকাঙ্খিত প্রকাশ। কালী প্রতিমার তাৎপর্য, তন্ত্র দর্শনের বৈজ্ঞানিকতা উপাস্যের বৈচিত্র্য, শিবলিঙ্গের তত্ত্ব, প্রতিমা পূজার আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে আলোচনা এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় শাস্ত্র উদ্ধৃত করে নিজের অনুভূতির আলোকে অনবদ্য আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলি নিয়ে অতীতে বহু বিতর্ক উত্থিত হয়েছে এখনো হয়। তার নিরসনে এমন যুক্তিযুক্ত অথচ সর্বজনবোধ্য প্রয়াস বেশী দেখিনি। প্রতীচ্যের যুক্তিগুলি এবং প্রাচ্যের অনুভূতির সমাহার ঘটিয়েছেন তিনি এই নিবন্ধগুলিতে। তিনি নিজে নিষ্ঠা সহকারে সাধনা করেন বলেই তার মর্ম এত সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন। অনেকের মতে বর্তমানের মুক্তিতীর্থ সোভিয়েত দেশ তিনি ভালোভাবে ঘুরেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তা ধারার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে বৃত্তিতে তিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যালোপেথিক

চিকিৎসক। আয়ুর্বেদে নিষ্ণাত, মনোবিজ্ঞানে অধিগতবিদ্য সরকারীভাবে পুরস্কৃত প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সু-অভিনেতা নাট্যকার, গণতান্ত্রিক চেতনার বুদ্ধিজীবিদের সংস্থার সভাপতি হয়েও তিনি মরমী উদার শাস্ত্রনিষ্ঠ সাধক। বোধিব্রতী নির্বৈর এই মনীষীর পরিণত প্রজ্ঞা এবং একনিষ্ঠ সাধনার ফল এই সদ্‌গ্রন্থ। যাঁরা না বুঝে পূজা করেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ দেবে আলো ও আনন্দ। যাঁরা না করে কটুক্তি করেন তাঁদের উন্মোচন করবে জ্ঞানদৃষ্টি। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় মননশীল সাহিত্যের একটী নন্দনীয় সম্পদ হয়ে থাকবে এই গ্রন্থ। আমাদের বৈদিকী তত্ত্ববিদ্যা এবং তান্ত্রিকী সাধনার সঙ্গম তীর্থে পরিণত হয়েছে এই গ্রন্থ।

তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম।
সর্ব কামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মিতম।

এই শাস্ত্র বাক্য তাঁর লেখনীতে স্পষ্টীকৃত হয়েছে। হারীত সংহিতায় বলা হয়েছে "শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" শাস্ত্রজ্ঞ মনীষী Dr M. S. Sakhare তার লিঙ্গ ধারণ চন্দ্রিকা গ্রন্থের সম্পাদনায় বলেছেন—'The influence of Tantrikism on the Vedas is clearly observable. It is not only in the Atharva Veda—the lastest Vedic Samhita, that all the elements of Tantrikism are Found, but they are also Found even in the earliest Vedic work the Rigveda, as well as in other parts of Vedic literature.

আমাদের পূজার্চনার তত্ত্ব ও আচারাদির উৎসানুসন্ধানে যাত্রা করলে বেদ এবং তন্ত্র উভয়েরই অনুশীলন অপরিহার্য। ডাঃ বাগচীর লেখনীতে তা পরিস্ফুট। লিঙ্গ পূজা সম্বন্ধে তাঁর অনুধ্যান শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসিদ্ধ। তার অপব্যাখ্যাকারীদের সম্বন্ধে বলা চলে আত্মবৎ মন্যতে জগৎ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তার মর্মের উদ্‌ঘাটনে বিকৃত ব্যাখ্যাতৃবর্গের চক্ষুরুন্মীলন হোক। তাঁর পৌত্তলিকতার আলোচনা এবং উপচার নিবেদনের মন্ত্রার্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ পূজককে গভীর অনুভূতিতে

আবিষ্ট করবে। ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তৃত আলোচনা শিক্ষিত মানুষের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের সাহায্য করবে। বস্তুবাদী মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রবাদ এবং ভারতের অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিনিষ্ঠ পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

বর্তমান গ্রন্থকার সম্বন্ধে কুল প্রদীপ গ্রন্থের বাণী উদ্ধৃত করা চলে।

যৈষাং দৃঢ়া ভক্তি রিহাস্তি লোকে
বিদন্তি সম্যক সকলং রহস্যম্।
প্রাগজন্ম পুণ্যাদ্ বিমলা মনীষা।
তে নিন্দকা নাস্ত ভবন্তি লোকাঃ॥

আমাদের ধর্মের মন্ত্রের ভাষা সংস্কৃতেই এই বরেণ্য লেখকের উদ্দেশ্যে বলি—

বৃন্দাবনঃ সুধী শ্রেষ্ঠ স্তপসোজ্বল চন্দ্রমা।
সরস্বতী কৃপা ধন্যো ধর্ম রক্ষতু সর্বদা
কর্মজ্ঞান সমাশ্রিত্য মাতৃভক্তি পরায়ণ
লোক সংগ্রহ মেবার্থং সংজীব শরদাংশতম।

ইতি—

ঋষিধাম — শ্রীমৎ সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব কিঙ্কর
দত্ত পুকুর (২৪ পরগণা) — শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ দেবশর্মা

: লেখক পরিচিতি :

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী।

জন্ম—বঙ্গাব্দ ১৩২২ সন ২০শে শ্রাবণ
ইংরাজী—১৯১৫ ৫ই আগষ্ট।

জন্মস্থান—অখণ্ড বঙ্গদেশ
পাবনা জেলা—চাটমোহর গ্রাম।

শিক্ষা—এম. বি. বি. এস., ডি টি. এম. (কলিকাতা)
আয়ুর্বেদ বিশারদ।

গবেষণার জন্য বারাণসী আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ও মানপত্র।

কর্মজীবনে—পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল সমূহে ত্রাণ কার্য্যে তিন বৎসর অতিবাহিত। দেশ বিভাগের পর রায়গঞ্জে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ।

পুরস্কার ও সম্মান—শিশু সাহিত্যে, লোক সাহিত্যে, নাট্য সাহিত্যে ও নবসাক্ষরগণের জন্য পুস্তক রচনায় চারবার ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। নাট্য রচনার জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের দিশারী পুরস্কার প্রাপ্ত। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (বার্ণপুর) কর্তৃক প্রবন্ধকার হিসাবে সম্বর্ধিত ও পুরস্কৃত। দেবানন্দপুর শরৎ স্মৃতি সমিতি কর্তৃক গল্প লেখক হিসাবে পুরস্কৃত।

উত্তরবঙ্গ দিপালী উৎসব কমিটি কর্তৃক সাহিত্য রত্ন পদকে সম্মানিত।
পশ্চিম দিনাজপুর মধুপর্ণী পরিষদ কর্তৃক প্রবন্ধকার হিসাবে সম্বর্ধিত।
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর সংস্থার সদস্য ভুক্তি।

সদস্য--দি এসিয়াটিক সোসাইটি। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। নিঃ ভাঃ শিশু সাহিত্য পরিষদ। কার্যাকরী সমিতির সদস্য জেলা ও মহকুমা—রেডক্রস সোসাইটি।

সভাপতি—গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি রায়গঞ্জ। জাতীয় শান্তি পরিষদ (দিল্লী)।

এছাড়াও আরও বহু সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত।

আন্তর্জাতিক সম্মান—সোভিয়েত সরকার কর্তৃক সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রিত। ওদেসার আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থার আজীবন সম্মানিত সদস্য।

গ্রন্থ রচনা—শিশু কিশোরদের বিজ্ঞান ভিত্তিক ছয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত।

গবেষণা গ্রন্থ—দুইখানি। উপন্যাস—তিনখানি। নাটক—তিনখানি। নবসাক্ষরগণের জন্য তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত।

এছাড়া বহু পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৪	বর্ণশুলি	বর্ণগুলি
১০	৬	গহে	গ্রহে
১৩	১৪	হল	হন
১৮	১	শ্লোকের পূর্বে প্রকীর্তিত	প্রকীর্তিত বাদ দিতে হবে
৩২	২২	কৃতধিয়াং	কৃতধিয়াং
৩৪	৪	নংদৃশ্যস্তে	সংদৃশ্যস্তে
৩৫	২	ভ্রহ্মণো	ব্রহ্মণো
৩৬	২	গ্রতার	একাগ্রতার
৪১	৩	যক্ষ	যজ্ঞ
৪৬	৯	পাঠিকা	পাঠিকা
৭৮	২৩	মহলকাব্য	মঙ্গলকাব্য
৭১	১০	আত্মিক আত্তিক্য	আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আস্তিক্য

ঃ সূচী-পত্র ঃ

কালী-প্রতিমায় বিশ্বজ্ঞান

হিন্দু অহিন্দু নির্বিশেষে কালী-প্রতিমা সবাই দেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত দেখছেনও। অহিন্দুগণ প্রতিমাপূজক হিন্দুদের নানা দেবদেবীর পূজার অন্যতম একটি বলে ব ঙ্গও হয়তো করেন। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণও কালী প্রতিমা সম্বন্ধে প্রচলিত কিছু ধারণার বাইরে আর কিছু চিন্তাও করেন না বা চিন্তনীয় কিছু যে আছে তাও মনে করেন না।

কোন্ গভীর অন্তর্জ্ঞানদ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে সিদ্ধ তন্ত্রোপাসকগণ এমনই এক মূর্তির কল্পনা করেছিলেন, কেনই বা সেই কল্পিত দেবীর ধ্যানমন্ত্রে পরস্পর বিরোধী ভাবমূর্তির কল্পনা হয়েছিল তার গভীর উপলব্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবেই তো কালী পূজার তাৎপর্য এবং ঐ পূজাজনিত আনন্দ ও সিদ্ধি লভ্য হবে মানব জীবনে।

বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—

কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি।
আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনী কোটিভিঃ সহ॥
অতোঽত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ।
বলিপূজাদিকং সবং নিশায়াং ক্রিয়তে তু যৎ।
তত্তদক্ষয়তাং যাতি কালী বিদ্যা প্রসীদতি॥

অর্থ ঃ—কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যায় কোটী যোগিনী সহিত মহাকালী আবির্ভূতা হন। ঐ দিন মানব তাঁর পূজা করবে। রাত্রিতে বলিপূজা যা করা যায় তাই অক্ষয় হয় এবং দশমহাবিদ্যার আদি কালী বিদ্যা প্রসন্ন হন।

কেউ কেউ বলেন—আবির্ভূতা হয়েছিলেন তিনি কোনও এক কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে। সুতরাং ঐ দিন মহাকালীর জন্মদিন।

কিন্তু যিনি আদ্যাশক্তি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত হবার পূর্বে যাঁর অন্তরে নিহিত ছিল এবং ব্যক্ত হবার পরেও যাঁতেই বিধৃত তাঁর জন্মদিন কি করে হতে পারে ? জন্ম থাকলেই মৃত্যুও থাকবে।

মহাকালসংহিতায় মহাকালরুদ্র মহাকালী স্তোত্রে বলেছেন—

ন তে নামগোত্রে, ন তে জন্মমৃত্যূ
ন তে ধামচেষ্টে ন তে দুঃখসৌখ্যে।
ন তে মিত্রশত্রু ন তে বন্ধমোক্ষৌ
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

অর্থঃ—তোমার নাম ও গোত্র নাই, জন্ম ও মৃত্যু নাই, স্থান ও কার্যকলাপ কিছুই নাই। তোমার মিত্র ও শত্রু নাই, বন্ধন নাই, মোক্ষ নাই। তুমি পরব্রহ্মরূপেই সিদ্ধ।

তাহলে বিশ্বসার তন্ত্রের এই শ্লোকটি কোন্ ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকাশের জন্য রচিত হয়েছিল ?

সুদূর অতীতে কোনও এক কার্তিকের অমাবস্যা তিথিতে কোনও তন্ত্র-সিদ্ধ সাধক তাঁর দিব্যনেত্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী আদ্যাশক্তির দর্শন লাভ করে-ছিলেন। তাঁর ধ্যাননেত্রে পরিস্ফুট হল এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময়ী লীলাময়ী রূপের বিকাশ। সাধক বললেন, "আহা কি দেখলাম, ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী মা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে সাধককে কৃতার্থ করছেন। ওগো জগদ্বাসী, মায়ের এই রূপ দেখ, উপলব্ধি কর, আনন্দ সাগরে ডুব দাও।" কিন্তু ঐ দিব্যনেত্র তো সবার হয় না। তাই সাধক ধ্যান রচনা করলেন শ্লোকে বদ্ধ করে। বললেন, "তোমরা প্রতিমাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে আদ্যাশক্তিকে অন্তরে আনবার চেষ্টা কর।" যে ধ্যান আজ শ্লোকবদ্ধ হল, এর সম্যক্ চিন্তায় যদি অন্তর জাগ্রত করতে পার তবে ধর্ম কাম মোক্ষ সমৃদ্ধি সবই করায়ত্ত হবে। তোমার ইহকালের কামনা সকল মায়ের পদতলের বেলা-ভূমিতে লীন হয়ে যাবে।

"এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং
ধর্মকাম সমৃদ্ধিদাম্।"

আসুন ভক্তমণ্ডলী, আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিনী আদ্যাশক্তির ধ্যানকে অনুসরণ করে মায়ের রূপকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করি।

আদ্যাশক্তি কালীর ধ্যান—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥

সাধক বললেন, করালবদনাং ঘোরাং। ওঃ কি ভয়ঙ্কর রূপ। সীমাহীন অন্ধকার কোটী কোটী নক্ষত্র চেষ্টা করেও সে অন্ধকার দূর করতে পারছে না। প্রতি মুহূর্তে ঐ সীমাহীন অন্ধকার উদ্ভাসিত হচ্ছে এক একটি মহাকায় নক্ষত্রের ধ্বংসজনিত বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর দ্যুতিতে। ভীতি এসে গ্রাস করছে সাধকের হৃদয়কে। তাই তো! মায়ের এত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কেন। পরক্ষণেই শান্ত হল হৃদয়—না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু ঘোর মূর্তিই

তো নাই। আছে সৌম্যমূর্তি, আছে শান্তি, আছে সুখ। মানবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখদায়ক কত কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। আছে দর্শন-তৃপ্তির, স্পর্শ-তৃপ্তির, মনের পরিতৃপ্তির কত শত উপাদান। সাধক উপলব্ধি করলেন এটুকুও। তখনই উচ্চারণ করলেন, ঐ তো "হসন্মুখীং" ঐ তো "সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।" এত সব সুখের উপাদানের জননী তিনি—তাঁর মুখপদ্ম কি প্রসন্ন কি হাস্যময়ী। ভক্তের অন্তরে সব ভয় দূর করে সঞ্চার হল প্রসন্নতার।

তাই দুই বিপরীতার্থক ভাবধারা ধ্যানে ছন্দোবদ্ধ হল। তার বিশেষণগুলি হল -"করালবদনাং ঘোরাং", "ঘোররূপীং মহারোদ্রীং", "ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং" – আবার ঠিক বিপরীত "হসন্মুখীং", "সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্"।

এইবার আমাদের চোখের সম্মুখে যা সবচেয়ে দৃশ্যমান হল তা হল "চতুর্ভুজাম্" —মা হলেন চতুর্ভুজা। চার হাতে কি কি দেখেছেন সাধক—

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্॥

অর্থ:—বাম হস্তযুগলের নীচের হস্তে সদ্যছিন্ন শির, উপরের হাতে খড়্গ। আর দক্ষিণ দিকের উপরের হাতে অভয়, নীচের হাতে বর।

সাধক দেখলেন, এই বিশ্বে অনবরত ধ্বংসের তাণ্ডব চলছে—তার প্রতীক ঐ খড়্গ আর ছিন্ন শির। চণ্ডীতে বলা হয়েছে, দেবীর হাতে খড়্গ তুলে দিয়েছিলেন কাল—"কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং"। তাই খড়্গ ধ্বংসের প্রতীক। কাল পূর্ণ হলে বস্তুর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই বাম হাতে মা ধ্বংস করছেন সব। আবার দিব্যনেত্র উদ্ঘাটিত হল—কোথায় ধ্বংস—সব ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র, জীবনপ্রবাহ সবই পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে দক্ষিণ হাতের অভয় এবং বরের মহিমায়। আবার স্বকার্যে লিপ্ত হচ্ছে তারা। সাধক গেয়ে উঠলেন —

চারটি হাতের সুধা পিয়ে
এগিয়ে চল মন
বিশ্বজোড়া আলোর মেলায়
জাগে পরম ক্ষণ।

বাঁ হাতে তার আগুন ঝরে
গ্রহ তারা ভাঙ্গে চোরে
কালের খাঁড়ায় দেয় রে বলি
বিশ্ব অগণন।

দখিন হাতের অভয় পেয়ে
মায়ের কোলে আসে ধেয়ে
নূতন ক'রে জোড়ে আবার
ভাঙ্গা স্বরজগণ।

বর পেয়েছে নূতন করে
সৃষ্টি সুধার পুলক ঝরে
ভেঙ্গে আবার চলছে গড়া
একি অঘটন।

মহামায়ার লীলার খেলায়
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢেলায়
আদি অন্ত খুঁজতে গিয়ে
হারাস নে লগন।

তাই তর্ক যুক্তি ছুঁড়ে ফেলে
রাঙ্গা চরণ জড়িয়ে ধরে
শুধুই কৃপার তরে কাঁদে
দ্বিজ বৃন্দাবন।

কোথায় ধ্বংস কোথায় সৃষ্টি! শুধু রূপান্তর। কুঁড়ি রূপান্তরিত হয় ফুলে, কিন্তু কুঁড়ি ধ্বংস হয়। ফুল ধ্বংস হয়ে রূপান্তরিত হয় ফলে। এই ভাবেই ফল বীজে, আর বীজ গাছে রূপান্তরিত হয়। মায়ের চার হাতের এই লীলার স্বরূপ বুঝতে পারলে সাধক বিশ্বের অনন্ত প্রবাহে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। বলতে পারে ঐহিক দেহের মৃত্যুই চরম অবসান নয়—অনন্ত কাল ধরে এই অনন্ত জীবনের প্রবাহ চলছে ঐ চারটি হাতের লীলায়িত ভঙ্গিমায়। ঐ প্রবাহে রূপান্তরিত হতে হতে মানবাত্মা মহা উত্তরণের জন্য নিজকে প্রস্তুত করে চলেছে।

মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলছেন—

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥

অনাদিকাল থেকে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে যথাযথ সময়ে তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কার্যে প্রবর্তিত করছেন, সর্বদাই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করছেন, তাদের উত্তরণের পথ দেখিয়ে রক্ষা করছেন। এই কারণে তাঁর দক্ষিণ করদ্বয়ের বর ও অভয় কল্পনা করা হয়েছে।

ধ্যানে বলা হয়েছে "মুক্তকেশীং" এবং আর এক জায়গায় আছে "মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্"। সাধক সবিস্ময়ে দেখলেন আদ্যাশক্তির আপাত-করাল কিন্তু পরিণামে প্রসন্ন মুখখানির পিছনদিকে ঝুলছে কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা। কিসের যবনিকা? উপলব্ধি হল এলোচুল—মুক্ত এবং লম্বমান কেশদাম। কেন এই মুক্ত কেশ - কেশের ওপারে তো আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সাধক বুঝতে পারলেন এই কেশের যবনিকা হল মৃত্যুর যবনিকা। মায়ের এই কেশদাম কে দিয়েছিল—"যাম্যেন চাভবন্ কেশাঃ" যম অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা এই চুল দিয়েছিলেন। জীব যতদিন মৃত্যুর অধীন ততদিন পর্যন্ত মায়ের আপাতদৃশ্যমান রূপ দেখতে পাবে যদি তার আন্তর-সম্পদ মায়ের সম্পদে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এর পরেও তো কিছু আছে। তা দেখতে হলে মায়ের পরব্রহ্মরূপের সন্নিধানে যেতে হবে। আর তা সম্ভব হবে পঞ্চভূতাশ্রিত মনকে মৃত্যুরও ওপারে নিয়ে যেতে পারলে। যতদিন তা না হচ্ছে, মায়ের পশ্চাতের ঐ কৃষ্ণ যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হবে না।

ধ্যানে বলা হয়েছে "মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্"। মুণ্ডমালায় বিভূষিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। সাধক কেন বললেন এই কথা। মুণ্ড সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থিতিস্থান। মস্তিষ্কের আধার। সমগ্র উপলব্ধির কেন্দ্র এই মুণ্ড। মুণ্ডই নাদ উচ্চারণ করে। পঞ্চাশটি লিপির মধ্যে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তা এই মুণ্ডের সাহায্যেই। বিশ্বসারতন্ত্রে বলেছেন—

পরানন্দময়ং ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মবিভূষিতম্।
আত্মনো দেহ মধ্যে তু সর্বমন্ত্রাত্মকং প্রিয়ে।।

অর্থ ঃ জীবের আত্মদেহের মধ্যেই আনন্দময় পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মবিভূষি এবং সর্ব মন্ত্রাত্মক স্বরূপে অধিষ্ঠিত। পঞ্চাশটি লিপি সাহায্যে আমরা যে নাদ উচ্চারণ করি তাই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের হেতুস্বরূপ। কামধেনুতন্ত্রে বলা হয়েছে—

অকারাদিক্ষকারান্তা মাতৃকা বীজরূপিনী।
বিসর্গশ্চৈব বিন্দুশ্চ দ্বিসন্ধিব্রহ্মবিগ্রহা ॥
বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রশ্চ জায়তে দেবী জগৎসংহারকারণঃ ॥

অর্থ ঃ অকার হতে ক্ষকার পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণময়ী মাতৃকাশক্তিই এই নিখিল বিশ্বের বীজরূপিনী। তন্মধ্যে বিসর্গ শক্তি বিন্দু পুরুষ এবং উভয়ের সংযোগে অভিন্ন পূর্ণ ব্রহ্মরূপিনী দেবী মন্ত্রময়। বর্ণ থেকেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রজাপতি, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং জগৎ সংহারক রুদ্র উৎপন্ন হয়েছেন। এবার আমরা বুঝতে পারি মাতৃকাবর্ণ কেন বলা হয়। সৃষ্টি শক্তি, পালিকা শক্তি এবং সংহারিকা শক্তি সবই এই পঞ্চাশটি বর্ণে নিহিত। অবশ্যই ধ্বনি এবং উচ্চারণের তারতম্যে বর্ণগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই জন্যই মায়ের ভূষণ ছিল মুণ্ডমালা, যার সংখ্যা পঞ্চাশটি।

স্থূল বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বর্ণসমূহ কারণাকারে অব্যক্ত বা অব্যাকৃতরূপ প্রকৃতিগর্ভে বিলীন থাকে। তাই স্থূল সৃষ্টির পূর্বেও মুণ্ডমালা বা বর্ণমালার সত্তা বজায় থাকে। তাই সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।"

ধ্যানে বলা হয়েছে—"মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং
তথা চৈব দিগম্বরীম্।"

সাধক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই দুচোখের সাহায্যে দেখলেন। এই চোখে অন্ধকারময় অনন্তব্যোমের অন্ধকারময় রূপই প্রতিভাত হল। তাই তিনি বললেন প্রলয়কালীন মেঘের মত ঘন শ্যামা মায়ের বর্ণ কল্পনা করবে।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাঃ সর্বভূতানি শৈলজে।

অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥

শ্বেত পীত সমুদায় বর্ণ যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হয়। এই কারণেই যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলে নিরূপণ করেছেন।

আর "দিগম্বরীম্" অর্থাৎ আবরণহীনা—সত্যই তো এই ব্রহ্মাণ্ডকে কি দিয়ে আচ্ছাদিত করা যায়। তাই আদ্যাশক্তি আবরণের যোগ্যা নন। কোনো কোনো রুচিবাগীশ লোকে এই দিগম্বরী মূর্তিকে আদিম বর্বরতা বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সাধক যা দেখেছেন তাই বলেছেন, এবং সার্থক তাঁর এই দিব্য দৃষ্টি।

দেবীর ধ্যানে দুইবার তাঁর দাঁতের কথা উল্লিখিত হয়েছে—"ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং", আর এক বার "দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।"

সাধক মায়ের ঐ রূপ দেখতে বসে তাঁর প্রকটিত দন্তরাজি দেখেছেন। ঐ ধ্যানমন্ত্রকে অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে রচিত অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—"প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে।"

এই দন্তরাজির তাৎপর্য কি?

দন্তবিকসিত করে মানুষ হাসে—তেমনই মা আমার হাসছেন। দন্ত দিয়েছিলেন প্রজাপতি শক্তি। "তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।" তাঁর দন্তসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল প্রজাপতিশক্তির দ্বারা। বিশ্ব প্রজাসকল যে শক্তি থেকে সমুদ্ভূত, তাই হল প্রজাপতিশক্তি। জীবজগতের যে জন্ম-মৃত্যু-বিস্তার প্রভৃতি ষড়বিকার, তাই হল মায়ের হাসি।

আবার অন্য দিকে সাধক দেখলেন, দন্তসমূহ শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণের প্রতীক। সেই দন্তপংক্তির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে লোলজিহ্বা। রক্তবর্ণ অর্থাৎ রজোগুণের চিহ্ন। সত্ত্বগুণ সৃষ্টিসহায়ক নয়, রজোগুণ না হলে সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ঐ শুদ্ধ রজোগুণকে সৃষ্টিকার্যে ছেড়ে দিলে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি ও তার গতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে যায় সব কিছু। সমগ্র বিশ্ব—গ্রহ নক্ষত্র জীবপ্রবাহ যে সুশৃঙ্খল গতিতে ধাবমান

তা না হয়ে নিয়মহীনতার রাজত্ব হয়ে যাবে। কিন্তু মায়ের রাজত্বে তা তো হবার উপায় নাই তাই সত্ত্বরূপী দশনপংক্তি দিয়ে মা রজোরূপিনী জিহ্বাকে সংযত করেছেন। সাধকের চোখে এই সত্য ধরা পড়ল, তাই তো কালী প্রতিমায় দেখি মা রক্তবর্ণের লোলজিহ্বাকে সাদা দাঁতের দুইটি পংক্তি দিয়ে চেপে ধরেছেন।

এছাড়াও বলা হয়েছে —

গ্রসনাৎ সর্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্বণাৎ।
তদ্রক্তসজ্ঘা দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতম্॥

ধ্বংসকালে সমুদায় ভূতগণ ও সৃষ্টিকে কালরূপ দন্তদ্বারা চর্বণ করে গ্রাস করেন। সেই চর্বণের জন্য ঐ দন্ত কালের অস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। আর তজ্জনিত ক্ষরিত রক্ত সর্বাঙ্গে রক্তরঞ্জিত করে সেজন্য রক্তবাস কল্পিত হয়। আবার সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্তধারা বলেও এই কারণেই বলা হয়েছে।

ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে—"পীনোন্নত পয়োধরাম্ ।" সুপুষ্ট দুইটি স্তন মায়ের উর্ধ্বাঙ্গে বিরাজিত। দেবী দেহে স্তনযুগল সৃষ্টি হয়েছিল চন্দ্রের তেজে—"সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মম্।"

চন্দ্র ওষধিপতি। চন্দ্রের স্নিগ্ধকিরণে ওষধি সকল পরিপুষ্ট হয়। পরিণামে জীব পায় অন্ন। অন্নদ্বারাই জীবের স্থূলদেহ পুষ্ট এবং রক্ষিত হয়। তাই বিশ্বরূপিনী মায়ের ঐ পীনোন্নত স্তন থেকে যে সুধা ক্ষরিত হচ্ছে তাই সকল জীবের রক্ষা ও পুষ্টির অবলম্বন। আবার চন্দ্র হলেন মনের অধিপতি। আমাদের যা মন তা যদি মায়ের ঐ স্তনকে ঘনীভূত মাতৃস্নেহরূপে বুঝে নিতে পারে তবে ক্ষুদ্র শিশু যেমন মাতৃস্তনকে আশ্রয় করে নিজের অস্তিত্ব বুঝতে পারে সেই ভাবেই সাধকও ঐ স্তনের স্নেহসুধার আস্বাদে নিজের চৈতন্যসত্তার উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে বলা যায় কি অন্নময় কোষ, কি মনোময় কোষ, কি বিজ্ঞানময় কোষ সব কোষেই জীব মাতৃস্তন্য পান করে চলেছে। মায়ের প্রতিমায় তাই পীনোন্নত পয়োধরযুগল।

ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে—"শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।" অর্থাৎ হসন্মুখী মা শবসমূহের হস্তরাশি দিয়ে প্রস্তুত কাঞ্চী পরিধান করে আছেন।

শবসমূহের হস্ত সকল কেন? হাত কর্মশক্তির প্রতীক। মানুষ জীবিতকালে হাত দিয়েই কাজ করে। সুকর্ম হোক দুষ্কর্ম হোক সব কিছুই নিষ্পন্ন হয় হাতেরই সাহায্যে। হত্যাকারী যে হাতে অপরের বুকে ছুরি চালায়, পরোপকারী সেই হাত দিয়েই বিপন্নকে সাহায্য করে। মানুষ মরে যায়, তার কর্মের ফল গিয়ে সঞ্চিত হয় বিশ্বজননীর সঞ্চয়াগারে। আবার ফিরে আসবে জীবময় কোন গ্রহে দেহধারণ করে তার কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য। এই যে কর্মফল সঞ্চিত হয়, সাধক তাকেই প্রতীক হিসাবে দেখেছেন "শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং"। বিশ্বজননীর কাছে কিছুই ফেলা যায় না। ধ্বংস ও সৃষ্টির এই প্রবহমাণ লীলার মধ্যে সৎকর্ম দুষ্কর্ম সবকিছুই উপযুক্ত ফল প্রসব করে চলেছে। রূপান্তর মাত্র।

মায়ের চোখ কেমন দেখেছেন সাধক? "বালার্কমণ্ডলাকারলোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্।" মায়ের চোখ সৃষ্টি হয়েছিল পাবকের তেজে। "নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা।" এই ত্রিনয়ন নিষ্পলক উদীয়মান সূর্যের মত। অগ্নি বা পাবক তিন রকম—ভৌত অগ্নি—যা পৃথিবী বা জীবাশ্রিত অন্য গ্রহে স্থূল বিষয়াদির প্রকাশের জন্য বর্তমান। অন্তরীক্ষাশ্রিত অগ্নি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহা জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে যার অস্তিত্ব, আর জ্ঞান অগ্নি—যার মাহাত্ম্যে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতীত, অতীত, অনাগত যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থস্বরূপ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রে জ্ঞানই অগ্নিরূপে উপদিষ্ট হয়েছেন।—

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

এই হল মায়ের বালার্কমণ্ডলাকার ত্রিনয়নের রহস্য। যাতে এক মুহূর্তের জন্যও পলক পড়ে না—অচঞ্চল স্থির—সর্ব কালের সর্ব কর্মের সাক্ষী ঐ ত্রিনয়ন।

শশিসূর্য্যাগ্নিনৈত্রৈঃ অখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥

তিনি চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রসমূহ ও অগ্নিরূপ নয়নত্রয়দ্বারা অহরহ এই কাল-সম্ভূত জগৎত্রয় পর্যবেক্ষণ করছেন। এই কারণে সিদ্ধ সাধকগণ তাঁর তিনটি

নয়ন কল্পনা করেছেন। ঐ চোখে সাধক তার নিজের চোখ মেলাতে চায়, তার সমগ্র অন্তর উদ্ভাসিত করতে চায় ঐ জ্যোতিরাশির মধ্যে।

দুইটি বিষয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিনী জননীর স্বরূপে প্রচণ্ড শব্দের সন্ধান পেয়েছিলেন সাধক। এক—"ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।" দুই—'শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্॥"

এই ঘোর নাদ সকল অনন্ত মহাব্যোমে মাঝে মাঝেই স্পন্দন সৃষ্টি করছে। এই স্পন্দনের ফলে নূতন সৃষ্টি হচ্ছে, আবার ধ্বংসও হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে বর্ণমালার নানা ধ্বনির মধ্যে সূচনা হয় সৃষ্টির আবার ধ্বংসেরও।

শিবা বিপ্লবের প্রতীক -শিবার ঘোর রবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন সমুদ্রে কখন কোন কোণে এক একটি মহান্ নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে ধূলিকণায় -- বায়বীয় পদার্থে তেজোময় পদার্থে আবার ঘুরে ফিরে স্থূলতায় পর্যবসিত। প্রতিনিয়ত এই বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে বিভিন্ন কোণে। তার স্পন্দনে মহা ব্যোম স্পন্দিত। সাধক ধ্যাননেত্রে এই সব দেখলেন। (এই স্পন্দনতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে "তন্ত্রদর্শনে ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞান" প্রবন্ধে)।

মাকে বলা হয়েছে "শ্মশানালয়বাসিনীম্।" মা শ্মশানে বাস করেন। শ্মশান জীবের শেষ শয়ন স্থান। সকল কর্মের অবসানে কর্মফল মায়ের সঞ্চয়াগারে জমা দিয়ে শ্মশানে শেষ শয্যা বিছায় মানুষ, মায়ের আশ্রয় লাভ করে। সকল কর্মের অবসানে উন্নত আত্মার পরম মোক্ষধাম হচ্ছে মায়ের ক্রোড়। আবার নূতন জন্ম নেবার আগের অস্থায়ী বিশ্রামস্থলও মায়ের ক্রোড়। তাই মা আমার শ্মশানবাসিনী।

"শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্"—যখন ব্রহ্মাণ্ডে কাল ছিল না, ব্যোম্ ছিল না, সৃষ্টি ছিল না, পালন ছিল না, তখন আদ্যাশক্তি শবরূপ মহাদেবরূপে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে মৃতবৎ ছিলেন। তারপর জানা নাই কি কারণে আদ্যাশক্তি নৃত্যপরায়ণা হলেন। কাল সৃষ্টি হল, ব্যোম্ সৃষ্টি হল, তেজ নাদ স্পন্দন সব সৃষ্টি হল। শবরূপ মহাদেবের বক্ষের উপর নৃত্যপরা আদ্যাশক্তির রূপ সাধক দেখতে পেলেন। আসলে আদ্যাশক্তিই

এক সময়ে শবরূপী মহাদেব রূপে নিষ্ক্রিয় আবার যখন সক্রিয় তখন শবরূপী অবস্থা ত্যাগ করে তারই বুকের উপর নৃত্যপরায়ণা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মা ছাড়া আর কিছুই নাই। শক্তি ছাড়া কিছুই নাই। সেই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় তখন স্থূল, যখন সক্রিয় তখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতীত। একই শক্তির বিভিন্ন রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম।

আর একটি সুগভীর তত্ত্ব সাধক এই ধ্যানে শ্লোকবদ্ধ করেছেন—

শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥

এইখানে সাধকের অন্তর্জ্ঞান সুদূর বিশ্বসৃষ্টির আদিতে প্রবিষ্ট হয়েছিল।

যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় নাই তখন কাল, খণ্ডিত কাল, মহাকাল, মহাব্যোম্ কিছুই ছিল না। সমস্ত কিছু বীজরূপে শক্তির অভ্যন্তরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করছিল। তারপর শক্তি যখন শবরূপী শিবের বেশ পরিত্যাগ করে নৃত্যপরায়ণা হলেন তখন মহাব্যোম সৃষ্টি হল, সৃষ্ট হল মহাকাল। মহাকাল অর্থাৎ যে কালের আদি অন্ত গণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। সৃষ্ট হল কাল অর্থাৎ খণ্ডিত কাল। যে কালের পরিমাপ মানুষ করতে পারে সংখ্যা দিয়ে বা অন্য ভাবে। এই ব্যোমে মাতৃকাবর্ণের স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হল। কিন্তু যা ছিল না—এই হচ্ছে বা হল এ সবই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়। গর্ভে বীজ পতিত হলে ভ্রূণ ও শিশুর জন্ম কাল সাপেক্ষ। যদিও শক্তি এসকলের প্রসবকর্ত্রী, এমন কি মহাকালেরও। তথাপি শক্তি তো অপরিবর্তনীয়। তাঁর আদি নাই, অন্ত নাই, তাঁর বয়স নাই।—

ন বালা ন চ ত্বং বয়স্থা ন বৃদ্ধা
ন চ স্ত্রী ষণ্ডঃ পুমান্নৈব চ ত্বম্।
ন চ ত্বং সুরো নাসুরো নো নরো বা
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥

অর্থ: আপনি বালিকা, বয়স্থা, বৃদ্ধা কিছুই নন। আপনি স্ত্রী নপুংসক বা পুরুষ নন। দেবতা অসুর নর কিছুই আপনি নন। আপনি পরব্রহ্মস্বরূপা।

সুতরাং সৃষ্টির পরিবর্তনটুকুতে মহাকালই সেই ভূমিকা গ্রহণ করছেন। শক্তি সেজন্য বিপরীতরতিতে বিদ্যমানা অর্থাৎ মূল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা। এইভাবেই জন্ম হয়েছে মহাকালেরও। ইনি সদ্যোজাত মহাকাল—যাঁর পূজা হয় দেবী পূজার সময় দেবীর দক্ষিণে। এক কখনও বহুর জন্ম দেয় না, তার জন্য দুই দরকার। এই তত্ত্ব সেই দুই-এর তত্ত্ব।

সা শক্তিঃ দক্ষিণা কালী সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিনী।
সিদ্ধবিদ্যাসু সর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্॥
অবিনাভাবসম্বন্ধস্তয়োরের পরস্পরং।
শিবোঽপি তত্র যুক্তশ্চেৎ শক্তিঃ স্যাচ্ছিবযোগতঃ॥

(নিরুত্তর তন্ত্র)

সেই আদ্যাশক্তি দক্ষিণা কালীই সিদ্ধবিদ্যাস্বপিনী। এবং সেই দক্ষিণাই মূল প্রকৃতি এবং পুরুষরূপিনী। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের অবিনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ একের অবর্তমানে অন্যের স্বরূপসত্তা নাই। পুরুষ শক্তিযুক্ত হলে শিবস্বরূপতা লাভ করেন, আর শিবযুক্ত হলে প্রকৃতি শক্তি-স্বরূপা হল।

সর্বনিম্নের নিষ্ক্রিয় শবরূপী মহাদেব কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতীক। তার উপরে নিষ্ক্রিয় মহাকাল সৃষ্টি উন্মুখী সগুণ ব্রহ্ম। যিনি অদ্বৈতবেদান্তের মায়াধীশ ঈশ্বর, তন্ত্রে তিনিই কালী—নৃত্যচঞ্চলা লীলাময়ী মত্তা শক্তি। মহাকালের রূপান্তরই মহাকালী।

মহাকালতন্ত্রে বলেছেন—

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে।
বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে॥

পুরুষের নাম দক্ষিণ, শক্তির নাম বামা। যতদিন এই দক্ষিণ ও বাম সমবন্ধনে অবস্থিত ততদিন সংসারবন্ধন। সাধনার প্রখর প্রভাবে বামা শক্তি জাগরিত হয়ে দক্ষিণ শক্তিকে জয় করে আবার স্বয়ং দক্ষিণানন্দে নিমগ্ন হন অর্থাৎ কি বাম কি দক্ষিণ সকলটাই শক্তি প্রভাবে যখন একাকার হয়ে যায়

তখনই কেবলানন্দরূপিনী জীবের মহামোক্ষস্বরূপিনী হন। সেই জন্যই ত্রৈলোক্যের মোক্ষদায়িনী মায়ের নাম দক্ষিণা কালী।

এই তত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে "মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্"—এই দিব্য দৃষ্টি স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল।

পূর্ণজ্ঞানে উপনীত সাধক ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী মাকে দর্শন করে মূর্তি কল্পনা করলেন। সেই পথ অনুসরণ করে আমরা কালী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করি। বাহ্য পূজার সরল পথ ধরে প্রবিষ্ট হই আন্তর পূজা বা মানসপূজার মধ্যে। তাই তো আমরা সাধারণ মানুষ মৃন্ময়ী মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বলি—

ওঁ সর্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্তিঃ অত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্॥

কালী মূর্তির পূর্ণ তত্ত্বটুকু উপলব্ধি করে যদি আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিনী শক্তিময়ী চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তির চক্ষুর জ্যোতিতে নিজ দৃষ্টি মিলিয়ে নিয়ে তাঁর পীনোন্নত পয়োধরনিঃসৃত সুধার আস্বাদ গ্রহণ করে মায়ের ধ্বংসলীলা এবং সৃষ্টিলীলার অন্তহীন আবর্তকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে আমাদের সকল কাজকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করতে পারি তবে সাধকের শেষ আশ্বাসবাক্যটি আমাদের কাছে যথার্থ অর্থবহ হয়ে উঠবে।—

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং ধর্মকামসমৃদ্ধিদাম্॥

এই খানে সংশয়ান্বিত মন প্রশ্ন করতে পারে। যদি মেনেও নিই যে কালী মূর্তি-কল্পনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ সম্বন্ধে ধারণা, তাহলেও এর আরাধনা কেন। এর উত্তর—আমরা আমাদের চারদিকের পরিবেশে যে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করি আর তার ফলে আমাদের মনও ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে। জাগতিক সুখদুঃখকে সর্বস্ব মনে করে আমরা হানাহানি কামড়াকামড়ি করে যাই।

তার মধ্যে এই বিশাল উদার ব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত শৃঙ্খলা বৈচিত্র্যকে আরাধনা করে আমরা ক্রমে ক্ষুদ্রত্ব থেকে ভূমায় উত্তীর্ণ হতে পারি কারণ

আমরা বিশ্বাস করি এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি বিন্দুতে চৈতন্যময়ী শক্তির অধিষ্ঠান। সেই চৈতন্যময়ী শক্তি আমাদের উত্তরণের সহায় হন। মহানির্বাণতন্ত্র বলেছেন—

বাচাতীতা মনোঽগম্যা ত্বমেবৈকাবশিষ্যসে।
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥

বাক্যের অতীত, মনের অগম্য তুমিই সকল লীলার একমাত্র অবশেষ। সাকার হয়েও তুমি নিরাকারাই থাক অর্থাৎ সাকার রূপে সাধকের চোখের সামনে যখন আস তখনও কোনও আকারে আবদ্ধ জীবের মত আস না। মায়া প্রকটিত করে অনন্ত রূপে সাধকের সামনে আবির্ভূতা হও। তুমি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি। তুমি জগতের কর্ত্রী হর্ত্রী আবার পালিকা।

কাজেই এই রূপের ধ্যান এবং পূজার মধ্য দিয়ে মানুষ সেই ভূমা লোকে উত্তীর্ণ হতে পারে।

আসুন ভক্তগণ, পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই—

শ্রীমৎ সুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াং।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণমাম্যহম্॥
নমস্তে কালিকে দেবী নমস্তে ভক্তবৎসলে।
মূর্খতাং হর মে দেবী প্রতিভাপ্রতিদায়িকে॥
গদ্যপদ্যময়ীং বাণীং তর্কব্যাকরণাদিকীং।
অনধীতগতাং বিদ্যাং দেহি দক্ষিণকালিকে॥

মা আমার অজ্ঞানতা নাশ কর। জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহন করবার যত রকমের মাধ্যম আছে সবই তোমার কাছে প্রার্থনা করি।

তন্ত্রদর্শনে ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞান

পৃথিবীর অগণিত মানুষ—তারা লৌকিক অর্থে অশিক্ষিতই হোক বা শিক্ষিতই হোক সাধারণভাবে গতানুগতিক জৈবধর্মপ্রসূত ক্রিয়াদি পালন করেই জন্ম হতে মরণ পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। যে চিন্তা, যে প্রশ্ন এই জৈবধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন প্রশ্ন বা চিন্তা তাদের মনকে আকুল করে না। ঐ খাতে প্রবাহিত চিন্তা ছাড়া কূল ছাপিয়ে অন্য চিন্তার উদয়ও হয় না। আবার এমন মানুষও অনেক আছেন যাঁরা অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্রের পানে চেয়ে বৈচিত্র্যে ভরপুর জীবজগৎ, বৃক্ষজগৎ, প্রকৃতির পরিবর্তনশীল লীলা দেখে ভাবেন, এই সবের সৃষ্টি হল কোথা থেকে ও কিভাবে? প্রাণ এসে স্থূল জগৎকে জীবন্ত করল কেন ও কিভাবে? আমাদের আদি কি, আর অন্তই বা কি? আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল যেন অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। অনুসন্ধিৎসু মনও এই সব চিরন্তনী জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মহাকাশবিজ্ঞান (Cosmology) এবং পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) সব বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে। অন্বেষণ চলছে—শেষ নেই। মানুষ পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে চলেছে রহস্যের চাবিটাকে। একটা উত্তর যখন হাতের কাছে এসেছে মনে হয় অমনই আর এক অনুসন্ধিৎসুর অন্য সূত্র এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

আর্যভট, বরাহমিহিরের যুগ থেকে গ্যালিলিও কোপার্নিকাস নিউটনের কাল পেরিয়ে বর্তমান দিনের গুস্তাফ স্ট্রমবার্গ, হয়েল, জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার, টমসন সবাই নিজের নিজের রাস্তা ধরে খুঁজে চলেছেন সেই রহস্যের চাবিটাকে। এঁরা সবাই এক ধারাতে চলেছেন। গোটা কর্মকাণ্ডকে এঁরা জড়ের ধর্ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এঁদের অনুসন্ধানে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংমিশ্রণ অনুপস্থিত।

আবার অন্য দিকে উত্তর খুঁজেছেন আধ্যাত্মিকভাবধারাবাহী মনীষিগণ। এঁরা চৈতন্যময় সত্তাকেই জড়সত্তার চালিকা শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুগণ ঐশ্বরিক অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করে এই সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। তাই অধিকাংশ ধর্মীয় উপস্থাপনাই কল্পকথা বা কল্পিত আখ্যানের বাইরে কিছু বলতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল এবং তদনুসারী ইসলাম ঈশ্বরের ইচ্ছায় ছয়দিন ব্যাপী জগৎ সৃষ্টির কল্পকথাই বলে এসেছে। গোঁড়া খৃষ্টান বা গোঁড়া মুসলমান ছাড়া কোনও যুক্তিবাদী মনই তাদের স্ববিরোধী কাহিনী বিশ্বাস করতে পারবে না। হিন্দুদের পুরাণেও ঐ ধরণের কাহিনী আছে যা যুক্তিতর্কের আঘাতসহ নয়। কিন্তু তান্ত্রিক সিদ্ধান্তে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং বিবর্তনের যে কাহিনী এবং নিয়ম উদ্ধৃত হয়েছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে আশ্চর্যজনক মিলযুক্ত। অমিলও আছে—সেটুকু থাকবেই। দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য এবং জড়বাদের সঙ্গে চৈতন্যবাদীর বিরোধ।

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ শক্তি (Energy) ছাড়া অন্য দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেছে। সকল কিছুই শক্তির রূপান্তর। বস্তু (Matter) শক্তির ঘনীভূত রূপ আর শক্তি হল বস্তুর বিকীরণ রূপ।

তন্ত্রেও শক্তিকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়। শক্তি এই শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক বলে এই স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার করা হচ্ছে। না হলে আদ্যাশক্তি —

ন বালা ন চ ত্বং বয়স্থা
ন বৃদ্ধা ন চ স্ত্রী ন ষণ্ডঃ
পুমান্নৈব চ ত্বম্।

এই শক্তি বালিকা নয়, বৃদ্ধা নয়, যুবতী নয়, স্ত্রী বা পুরুষ বা নপুংসক কিছুই নয়।

এই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যা দেখি বা উপলব্ধি করি সব কিছুর মূলে ঐ আদ্যাশক্তি। সবই আদ্যাশক্তির রূপভেদ মাত্র।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে মহাব্যোম (Space), কাল (Time), মহাকাল (Eternal non-divisible time) সবকিছুই আদ্যাশক্তিতে নিহিত ছিল।

প্রকীর্তিত কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥

সর্বজীব এবং কালকে (অর্থাৎ যে কালকে আমরা গণনা করি) গ্রাস করেন মহাকাল। আবার মহাকালকে গ্রাস যিনি করেন তিনি আদ্যাশক্তি মহাকালী। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে মহাব্যোম, মহাকাল এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহসমূহে বিচরণকারী প্রাণীদিগের প্রাণের বীজ আদ্যার গর্ভে নিহিত ছিল। তিনি তখন শবরূপী মহাদেবরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় যখন মহাব্যোমের অস্তিত্ব ছিল না তখন আদ্যা-শক্তির আধার কি ছিল, কোথায় ছিল এর অবস্থান এই বিষয়টি মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তাই ব্রহ্মও কিছু বলেন নাই এবং জড়বিজ্ঞানীরাও নির্বাক। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্র পাওয়া যায়—"তমসো তমসাসীৎ গূঢ়মগ্রে।" অন্ধকারের গর্ভে শুধুই অন্ধকার। এছাড়া ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে তিনটি বিখ্যাত মন্ত্রে এই উপলব্ধির অস্তিত্ব দেখা যায়—

১। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।

—সেই সময় সৃষ্টির পূর্বে যা নাই তাও ছিল না যা আছে তাও ছিল না। দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষলোক কিছুই ছিল না।

২। ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস।

—মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। রাত্রি দিন বা অন্য কিছুই ছিল না। একমাত্র চৈতন্য নিজেকেই নিজের মধ্যে ধারণ করে অবস্থান করছিলেন বায়ুশূন্য ক্রিয়ার দ্বারা। ছিল শুধু স্পন্দন।

৩। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।

—সেই অদ্বিতীয় শক্তি তুচ্ছ আবরণের মধ্যে ঢাকা ছিল। তপসঃ অর্থাৎ স্পন্দনক্রিয়ার মধ্যে তিনি জাত হয়ে সব সৃষ্টি করলেন।

এই তিন মন্ত্রে চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তির তুচ্ছ আবরণে ঢাকা অবস্থায় থেকে পরে সব কিছু সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মহাভাগবতে এই বিষয়ে পাওয়া যায়—

আসীজ্জগদিদং পূর্বমনর্কশশিতারকং
অহোরাত্রাদিরহিতমনগ্নিকমদিঙ্মুখং
শব্দস্পর্শাদিরহিতমন্যতেজোবিবর্জিতং
তৎ সদ্ব্রহ্মেতি বত শ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে
স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।

সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারকা বর্জিত এবং অহোরাত্র বিবর্জিত ছিল। কোনও অগ্নিই ছিল না, দিগ্‌দিগন্তের কোনও নির্ণয়ও ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন শব্দ-স্পর্শাদিরহিত অন্যতেজোবিবর্জিত অন্ধকারময় ছিল। সত্য সত্যই আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিও এখানে অন্ধকারে ঘুরে মরে—সন্ধান পায় না।

এই অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হল। কেন হল, অধ্যাত্মবাদীগণ তার কারণ নির্ণয় করলেন—

শিবেচ্ছয়া পরা শক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব॥

(বায়ুসংহিতা)

শিবের ইচ্ছায় শক্তি বিস্ফুরিত হলেন। আদি কর্মকাণ্ডের বর্ণনা কালীর ধ্যানে বলা হয়েছে—"শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্"। শিবা বিপ্লবের প্রতীক। শবরূপী নিষ্ক্রিয় শক্তিতে বিপ্লব ঘটল। নিষ্ক্রিয় জড়রূপী শক্তি বিস্ফুরিত হয়ে সক্রিয় হলেন।

প্রথমে সৃষ্টি হল মহাব্যোমের (Space)। তারপর সমস্ত মহাব্যোম নাদসমুদ্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

বর্তমান বিজ্ঞানেও এই সত্য স্বীকৃত যে অনুভবযোগ্য শব্দই গন্ধ বর্ণ প্রভৃতির জনক। এক এক ধরণের কম্পনতরঙ্গ আমাদের অক্ষিপটলে এক এক বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই কম্পনতরঙ্গ (Vibration) নানা

রকমের হল। তন্ত্রদর্শনে এই পর্যবেক্ষণশক্তি যতদূর পৌঁচেছে তাতে এই নাদকে মূলতঃ পঞ্চাশ রকমের বলা হয়েছে। তন্ত্রে এই পঞ্চাশ রকমের নাদকে মাতৃকা বর্ণের সাহায্যে উচ্চারণ করা হয়েছে—

অকারাদিক্ষকারান্তা মাতৃকা বীজরূপিনী।
বিসর্গশ্চ বিন্দুশ্চ দ্বিসন্ধিত্রক্ষবিগ্রহা॥

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের ধ্বনিই সকল সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংসের মূল। সেজন্যই এগুলিকে মাতৃকাবর্ণ বলা হয়। এর মধ্যে স্বরবর্ণাত্মক নাদকে সৃষ্টিধর্মী নাদ বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত সমস্ত স্পর্শবর্ণ স্থিতিধর্মী আর শ ষ স হ এই উষ্মবর্ণসম্ভূত নাদ ধ্বংসাত্মক ধর্ম পালন করে। বিসর্গ এবং বিন্দু এই দুটি সবকিছুর সন্ধিস্থলে অবস্থান করে। তন্ত্রদর্শনে এই সব নাদের আরও সূক্ষ্ম বিভাজন বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণের নাদ যদি এক মাত্রা ধরা যায় তবে একটি মাত্রার ১২৮ থেকে ২৫৬ পর্যন্ত বিভাজন সম্ভব হয়েছে। "অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।" এই অনুচ্চার্য মাত্রাই বর্তমান বিজ্ঞানে Ultra sonic শব্দতরঙ্গ বলে অভিহিত। এটা শোনা যায় না, উচ্চারণও অত্যন্ত কঠিন যোগাভ্যাস সাপেক্ষ। এই কম্পনতরঙ্গকে তন্ত্রে ব্যাপিনী এবং সমনা বলে বিভাগ করেছেন সাধকগণ। মহাব্যোম এই নাদের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হল, এই কম্পনের ফলে জ্যোতিরও বিকাশ ঘটল। যতক্ষণ পর্যন্ত নাদ ও জ্যোতিদ্বারা বিশ্বকে উদ্‌ভাসিত না করল ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল তারপর যে রশ্মিমালা নাদজ্যোতিরূপে মহাব্যোমে ব্যাপ্ত হয়েছিল তা ঘনীভূত হয়ে বিন্দু সৃষ্টি হল। সূক্ষ্মতা থেকে স্থূলত্ব গ্রহণ করবার সন্ধিস্থল হল বিন্দু। বিন্দুই আরও ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র এবং পরে গ্রহের সৃষ্টি হল।

ব্রহ্মাণ্ডের এই ক্রমবর্ধমান স্থূলত্বের চারটি স্তর তন্ত্রে উক্ত হয়েছে— মহাকারণ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলত্ব প্রাপ্তির তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্তরে প্রাণের বীজ আরোপিত হল। অর্থাৎ অব্যক্ত যে প্রাণের বীজ আদ্যাশক্তির গর্ভে নিহিত ছিল, রূপান্তরের তৃতীয় স্তরে তার স্পন্দন আরম্ভ হল। কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াই নাদের শক্তি সাপেক্ষ। বর্তমান বিজ্ঞানেও

স্বীকৃত হচ্ছে যে প্রাণের বীজ মহাব্যোম থেকে এসেছে। কিন্তু আরও স্থূল পরিবেশ না পেলে প্রাণের বিকাশ ঘটে না। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর মত আর যত জীববাসের উপযোগী গ্রহ আছে তাতে স্থূলত্বের ক্রমবিকাশে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং মরুৎ ও ক্ষিতির সৃষ্টি হল।

এই বিশাল সৃষ্টিতত্ত্বে নাদের স্থান সর্বাগ্রে। বর্তমান বিজ্ঞানেও নাদ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। বর্তমান দিনে অনুচ্চার্য্য শব্দতরঙ্গ (Ultra sonic sound) Hertz-এর unit দিয়ে গণিত হয়। ১৯৬ Hertz-এর তরঙ্গের সামনে সুদৃঢ় ইমারত পর্য্যন্ত ভেঙ্গে পড়তে পারে। ৩.৫ Hertz-এর তরঙ্গ বৃত্তের মধ্যে মানুষ বা জীবের মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের ধর্মগ্রন্থে দেবী বা শক্তির হুঙ্কারে অসুরের অস্ত্রশস্ত্র বা অসুরের প্রাণনাশও হয়েছে। চণ্ডীতে আছে, ধূম্রলোচন যখন দেবীকে ধরবার জন্য অগ্রসর হল তখন দেবী তাকে হুঙ্কারদ্বারাই ভস্মীভূত করলেন।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥

ধূম্রলোচন দেবীর দিকে যখন অগ্রসর হল তখন অম্বিকা হুঙ্কারদ্বারাই তাকে ভস্মীভূত করলেন।

অথবা—

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥

সে (চামর) দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করলে দেবী হুঙ্কারনাদে তা প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করে ভূতলে পাতিত করলেন।

দেবীর মুখে উচ্চারিত সঠিক নাদের ক্ষমতা এই সব শ্লোকে বলা হয়েছে।

মোটের উপর এটি বোঝা যায় যে নাদই ক্রমশঃ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হতে হতে আমাদের এই পৃথিবীর মত যত গ্রহ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, সর্বত্র পঞ্চভূতাত্মক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এবং ক্রমাগত হচ্ছেই। বর্তমান বিজ্ঞানে Hoyle-এর অন্তহীন সৃষ্টিতত্ত্ব এবং Bennet-এর অন্তহীন প্রসার (Theory of

eternal dimension) তন্ত্রের এই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তন্ত্রে শক্তির এই প্রসার—বহির্গতি, অন্তর্গতি, অধোগতি, ঊর্ধ্বগতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্মিলিতভাবে কালচক্ররূপে কল্পিত হয়।

কিন্তু এই প্রসারেরও সীমা আছে। কারণ শক্তির যেমন প্রসার আছে তেমনই সংকোচও আছে। প্রসারশক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন সঙ্কোচ-শক্তি প্রাধান্য লাভ করে। শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচশক্তি সব কিছুকে গুটিয়ে নিয়ে মহাকাল—কাল—মহাব্যোম—আবার সেই শবরূপী মহাদেবের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে যাবে। যতদিন না আবার শিবের ইচ্ছায় প্রসারশক্তি প্রাধান্য লাভ করবে। এই লীলা অনন্ত কাল ধরে চলেছে। তন্ত্রে একেই কালচক্রের আবর্তন বলা হয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের Big Bang Theory এই বর্ণনার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিবের উক্তি—

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি ॥
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥

জগৎসংহারক মহাকাল তোমারই রূপান্তর। মহাসংহার সময়ে কাল সব কিছুই গ্রাস করবেন। সেই সর্বভূত এবং কালকে যিনি গ্রাস করেন তাঁর নাম মহাকাল। আর মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন, তাঁরই নাম কালিকা।

বর্তমান বিজ্ঞানীরাও যোগসিদ্ধই। তাঁদের চিন্তাধারা এবং তন্ত্রের চিন্তাধারা প্রায় একরকম। তবে বিজ্ঞানীগণ সব আবর্তন বিবর্তন সৃষ্টি সংহার জড়ের ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু তন্ত্রসিদ্ধ সাধকগণ এগুলিকে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বলেন। চৈতন্যই মূলতত্ত্ব। শক্তির মধ্যে চৈতন্যেরই বিকাশ।

তন্ত্রসাধকগণ সমস্ত বিশ্লেষণ করে মূলে সেই বাক্যমনের অগোচর চৈতন্যময়ী শক্তির কথাই বলেছেন।

বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেবৈকাবশিষ্যতে।

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।

ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥

(ব্যাখ্যা কালীতত্ত্বে দেওয়া হয়েছে।)

এ বিষয়ে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রে শ্রীবিদ্যাযন্ত্র এবং তার পূজাদি দেখা যায়। শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের অঙ্কন প্রণালী অত্যন্ত জটিল। এই যন্ত্রের অভ্যন্তরে সংহারচক্র স্থিতিচক্র এবং সৃষ্টিচক্রের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে জনৈক সোভিয়েত বিজ্ঞানী গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ঐ শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের অঙ্কন প্রণালী দেখে আকৃষ্ট হন। বহু আয়াসে তিনি ঐ যন্ত্র আঁকেন। এমন জটিল অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার তন্ত্রে আছে দেখে তিনি অনুসন্ধিৎসু হন। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন 'এত জটিল অঙ্কশাস্ত্রের পদ্ধতি অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সাধকগণ কিভাবে আয়ত্ত করেছিলেন ভেবে বিস্মিত হই'। পরে তিনি আরও বিস্মিত হন যখন কম্পিউটারের সাহায্যে ঐ যন্ত্রের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সবটুকুর অর্থ উদ্ধার না হলেও কম্পিউটারে তিনি পেয়েছিলেন 'প্রচণ্ড উত্তাপ' এবং 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণ' নির্দেশ করছে যন্ত্রের একাংশ। অন্য অংশ 'প্রচণ্ড শব্দ' ও 'কম্পন' নির্দেশ করছে। তাঁর মতে তন্ত্রক্রিয়ার আচার হিসাবে এই যন্ত্রের ব্যবহার সাধকগণের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানেরই ফল। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়েই তাঁরা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য বুঝিয়ে গেছেন। যা নির্ণয় করতে বহু উন্নতমানের কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে।

তন্ত্রদর্শনে ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞান গোঁজামিল দেওয়া রূপকথা বা কল্পকথা নয়। যথার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপলব্ধি ও আলোচনা।

নাদশক্তির ও মাতৃকাবর্ণের উচ্চারণাদি যথার্থ আয়ত্ত করতে পারলে সাধক কিছু কিছু সৃষ্টি করবার অধিকারী হন। বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টিও এই নাদশক্তিকে আয়ত্ত করবারই ফল। মহাযোগী স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বস্তুকে পরিবর্তন করতে পারতেন। পতঙ্গ সৃষ্টিও তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল। অথচ তিনি কোন বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীর সাহায্য নেন নাই।

এমন দু-একজন তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের কথা জানা যায় যাঁরা অগ্নিবীজ আয়ত্ত করেছিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালক কোনও বস্তু ছাড়াই যজ্ঞকাষ্ঠে সজ্জিত স্থণ্ডিলে অগ্নি প্রজ্বালিত করতেন শুধু অগ্নিবীজ উচ্চাচরণের দ্বারা।

তন্ত্রদর্শনে যে ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা পুরাণের কল্পকথা নয়, রূপকথা নয়। মস্কোর গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানীর দ্বারা কম্পিউটারে পরীক্ষিত শ্রীবিদ্যাযন্ত্রের নির্দেশ তার আংশিক প্রমাণ।

অবশ্য এই শাস্ত্র আয়ত্ত হলেই এর সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব। তন্ত্রে বলা হয়েছে এই শ্রীবিদ্যা আয়ত্ত হলে সাধক সৃষ্টি স্থিতি লয়ের রহস্য করায়ত্ত করতে পারে।

উপাস্যভেদ হয় কেন ?

আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতা আরাধনার ব্যবস্থা আছে। মানসিকতা ভেদে ভিন্ন উপাস্য গ্রহণের প্রবণতা মানুষের মধ্যে কমবেশী দেখা যায়। খৃষ্টানদের মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায় যীশু ও মা মেরী উভয়েরই মূর্তি গড়েন ও পূজা করেন অবশ্যই তাঁদের নিয়মমত। আবার প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় মা মেরীর পূজা স্বীকার করেন না। খৃষ্টানদের ত্রিতত্ত্ব (Trinity) ঐ উপাস্যভেদের প্রকারভেদ মাত্র। মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ মুসলমানদের থেকে সুফী সম্প্রদায়ের মতের পার্থক্য দেখা যায়। তাঁরা আয়নল হক্ (সোঽহং) বলতে দ্বিধা করেন না। আবার ইসমাইলি সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মগুরুকে উপাস্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু হিন্দুগণ প্রকাশ্যভাবেই উপাস্যভেদ স্বীকার করে। সেজন্য অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি তাদের ব্যঙ্গও করে। তেত্রিশ কোটী দেবতার উপাসক পৌত্তলিক বহু-ঈশ্বরবাদী প্রভৃতি বিশেষণ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু কেন এই উপাস্যভেদ স্বীকার করা হয়েছে যদিও শিব কালী দুর্গা নারায়ণ এঁরা অভিন্ন একথা বার বার বলা হয়। এর নিশ্চয়ই যুক্তি আছে, নিশ্চয়ই যুক্তিগ্রাহ্য হেতুও আছে। নাহলে হিন্দু সাধকগণ অসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়েও আপাতচক্ষে যা ভেদজ্ঞান বলে প্রতিভাত তার ব্যবস্থা করলেন কেন।

পরবর্তী কালের সাধকগণের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছিলেন "যত মত তত পথ।" অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনার বহু পথ বহু মনীষী কর্তৃক উক্ত হয়েছে – কোনটাই অবহেলার যোগ্য নয়। সব মতই গ্রহণযোগ্য এবং সব মতই পথের সন্ধান দিয়েছে। সত্য সত্যই

অধিকাংশ সাধক মহাত্মাগণই এই ধরণের উপদেশ দেন নাই, তাঁরা নিজের নিজের মত অনুযায়ী পথ নির্দেশ করেছেন শিষ্য ও ভক্তদের। ইসলামধর্মের নবী বলেছেন তাঁর প্রদর্শিত পথ যে মানে না সে বিধর্মী, তার স্থান দোজখে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণ অতটা কঠোর না হলেও রামকৃষ্ণদেবের মত এই উদার ঘোষণা খুব কম সাধকই করেছেন। বহু যুগ আগে দ্বাপরে আর এক ধর্মাত্মা জ্ঞানতপস্বী এই ধরণের উক্তি করেছিলেন তিনি হলেন যুধিষ্ঠির।

ছদ্মবেশী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যখন চার ভাই দ্রৌপদী সবাই মৃত বা মৃতকল্প সেই সময়েও তাঁর উত্তর স্থৈর্য্য এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। ছদ্মবেশী ধর্মের "কঃ পন্থাঃ"—পথ কি এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

বেদ স্মৃতি সবই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। নানা মুনি নানা রকমের মত প্রকাশ করেন। ধর্মতত্ত্ব নিগূঢ়। তার নিরূপণ খুবই দুরূহ। মহাপুরুষগণ যে পথ নির্দেশ করেন সেই পথে চলাই যুক্তিসম্মত।

আমরা রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং যুধিষ্ঠিরের কথা থেকে পাই যে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেন। এইবার বিশ্লেষণ করা যাক, মুনি কাকে বলা হয়। আর মত কথাটারই বা অর্থ কি। এই কথাটাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। কারণ সত্য এক ও অখণ্ড। মুনিঋষিগণ সত্যদ্রষ্টা। তাহলে মতভেদ হয় কেন?

মুনি কে?—যিনি মননশীল, যাঁর মন জ্ঞানের সুগভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ তিনিই মুনি।

মত কথাটারই বা অর্থ কি? মনের দ্বারা যা অঙ্গীকৃত অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হতে পারে তাই হল মত। মনকে অবলম্বন করে সত্যের সবটুকুকে দেখা দুরূহ শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব।

অখণ্ড সত্যের ধারণা করতে হলে মনকে রুদ্ধ করে অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মনের ওপারে চলে যেতে হবে। মন বা অন্তঃকরণের পরপারে আত্মার স্বয়ং প্রকাশিত আলোক অবস্থিত। মন ঐ সম্পূর্ণ আলোককে নিজের বিকল্প শক্তির দ্বারা ভাগ ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে।

সাধক যখন মনের বশ্যতা ত্যাগ ক'রে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন তখন তাঁর 'মত' বলতে কিছুই থাকে না। কারণ মনের কোনও ক্রিয়াই ঐ সময়ে নাই। কিন্তু ঐ অখণ্ড সত্যের রূপ সংক্রমণযোগ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি মনের অধীন সে ঐ মনের অতীত মতকে বিকল্পভাবে ছাড়া দেখতেই পাবে না। ঐ সত্য এক আধার থেকে অন্য আধারে সংক্রমণ হতে পারে না। যে সাধক ঐ স্বয়ং-প্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হতে পারেন তার কাছে আপনিই প্রকাশিত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে সিদ্ধ সাধক ঐ জ্ঞানকে অজ্ঞানী অথচ শ্রদ্ধাবান অনুরক্ত ভক্তজনকে কিভাবে সংক্রমণ করবেন। এই প্রশ্নের উত্তর হল—মনের আশ্রয় গ্রহণ করে। মনের ধর্মই হল বিকল্প বৃত্তি। বিকল্প বৃত্তিই খানিকটা কল্পনাকে আশ্রয় করে। কাজেই সাধক ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্প বৃত্তি বা কল্পনার সঙ্গে যুক্ত না করলে প্রকাশ করতে পারেন না। এই প্রক্রিয়াতে তাঁর মতের সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জিজ্ঞাসুর চিত্তের বাসনা, প্রকৃতি অনুভব ও বিচারের ক্ষমতা। সাধক এই সব বিচার করে তাকে তাঁর মত অনুযায়ী সাধনার পথ দেখান। সেই জন্য মুনিগণেরও মতভেদ হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মনই এই উপলব্ধি এবং প্রকাশের মূল চালক। আর এই মন সব মানুষের মধ্যে এক ছাঁচে ঢালা নয়। দেহের গঠন, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া, উত্তরাধিকার, পরিবেশ অনুসারে মনের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই পার্থক্য অনুযায়ী বহিরঙ্গে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ শান্ত, স্নেহ, মমতা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, ভীরুতা. সাহসিকতা যেরূপ মানুষ ভেদে কারও বেশী কারও কম হয়, অন্তরঙ্গেও অর্থাৎ কল্পনা প্রবণতা, একাগ্রতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, ভক্তি প্রভৃতিতেও অনুরূপই দেখা যায়।

এই পার্থক্যজনিত খাদ্য, শয্যা, পরিচ্ছদে যেমন রুচিভেদ দেখা যায়, পঠিত বই, আলাপ বা সঙ্গলাভ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রুচিভেদ দেখা যায়, তেমনি আর একটু উন্নত স্তরের মনের বাসনার সামগ্রী যে উপাস্য বা ইষ্ট সেক্ষেত্রেও রুচিভেদ দেখা যাবেই। কারণ এক অখণ্ড সত্যকে আশ্রয় করা মনের সাধ্য নয়। বিকল্পকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ভাবধারা সৃষ্টি মনের স্বভাব। তাকে দোষ বলা যায় না। কেউ উপাস্যকে মাতৃরূপে পেলে সুখী হয়, কেউ প্রভু রূপে, কেউ দয়িত রূপে। এই সব ক্ষেত্রে শক্তি উপাসনা, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করতে হয়। তবে এই উপাসনার ধারা তো নিজে নিজে সৃষ্টি করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। কোনও সাধক যে মত প্রচার করেছেন তার মধ্যে যে কোনও একটাকে আশ্রয় করে নিতে হয়। এই আশ্রয় করে নিজের নিজের মনকে একাগ্রভাবে ঐ দিকে চালিত করতে পারলে সেই সেই ইষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হতে পারেন। এই আবির্ভাব মনের উন্নত অবস্থার একাগ্রতারই একটা পরিণাম।

একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসীর জীবনীতে পড়েছিলাম, ঐ ভক্ত তাঁর ভবিষ্যৎ ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধায় পড়ে যীশুকে বারম্বার প্রার্থনা করেন। এক রাত্রে স্বয়ং যীশুখৃষ্ট তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে সেবাধর্মের পথ নির্দেশ করেন। অথচ যীশুখৃষ্ট মূর্তি ধারণ করে আসতে পারেন কি না নিশ্চয় বলা যায় না। এইবার আমাদের শাস্ত্র অনুমোদিত কয়েকটি আখ্যান উদ্ধৃতি দিয়ে মন কিভাবে ইষ্টদর্শনে নিয়োজিত হয় তার ব্যাখ্যার চেষ্টা করব।

আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী সেই অখণ্ড সত্য চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কোনও মূর্তি নাই। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমূহে তাঁর ব্যাপ্তি—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বস্তুতে যাঁর ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান তাঁকে মানুষের মন দিয়ে কল্পনা করাও দুরূহ। কাজেই সাধকের সংস্কার অনুযায়ী তাঁর মূর্তি গঠিত হয়। সাধক যে মূর্তিতে তাঁকে সাজান, তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করে, সেই মূর্তিতেই তাঁকে দেখেন। শাস্ত্রে বলে—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

অথবা মহানির্বাণতন্ত্রে—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।

কল্পিতায় হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥

অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের হিতের জন্যই তাদের গুণানুসারে নানারকমের রূপের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভক্তগণ বিভিন্ন রূপকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের একাগ্র সাধনার দ্বারা।

হিরণ্যকশিপুর আখ্যান প্রথম উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজ—অসুর ভাবধারার জাগ্রত মূর্তি।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।

অজ্ঞানঃ চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥

দর্প, অহমিকাবোধ, ক্রোধ, ধন ও কুল নিমিত্ত অভিমান, কর্কশতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি সবকিছুই তার মধ্যে অবস্থিত।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।

'এই শত্রু আমি নাশ করেছি, অন্য শত্রুও নাশ করব। আমি সকলের নিগ্রহে সমর্থ, আমি ভোগী, আমি বলবান্ আমিই ঈশ্বর—আমার সমান আর কে আছে'—এইভাবে পরিপূর্ণ।

তার পুত্র প্রহ্লাদ হরিকে উপাসনা করে। শুধু উপাসনা নয়, হরিই যে জগতের কর্তা, সৃষ্টি স্থিতি লয় যে তাঁরই বিভূতি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রচার করে। হাতে বহু ক্ষমতা বহু বলের অধিকারী হিরণ্যকশিপু পিতা হয়েও পুত্রস্নেহ বিসর্জন দেয় আসুরীভাবের অজ্ঞানতায় এবং দম্ভে। নানাভাবে নির্যাতন করে প্রহ্লাদকে শুধু তার মনকে হরিগুণগান থেকে বিমুখ করতে। কেন করে? বালক প্রহ্লাদ তো তার রাজ্য কেড়ে নিতে আসে নি? আর তার লোকবলও এমন নয় যে হিরণ্যকশিপুর বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু অসুরভাবের বিশেষত্বই হল অজ্ঞানতা, মোহ, দম্ভ। 'ঈশ্বরোঽহম্'—আমিই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ এই কথা মানে না। নানারকম নির্যাতনের পরেও প্রহ্লাদের স্থির অচঞ্চল মূর্তি

দেখে হিরণ্যকশিপুর মন চরম ক্রোধের বশীভূত হল। সঙ্গে কিন্তু ভয়েরও সঞ্চার হয়েছে—কে সেই হরি যার আশ্রয় লাভ করে প্রহ্লাদ এত নির্যাতনের মধ্যেও অচঞ্চল? সে কি আমার চেয়েও বলবান্? তাকে দেখতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে যুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারব তো? ক্রোধে অন্ধ হয়ে সে প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করে তার হরি কোথায় থাকে। ভক্ত প্রহ্লাদ বলে তিনি সর্বব্যাপী।

তবে কি সে এই প্রাসাদের মধ্যেও আছে ?—হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করে ক্রোধপ্রদীপ্ত কণ্ঠে।

প্রহ্লাদ বলে "হাঁ আছেন।"

—এই স্তম্ভের ভিতরেও কি সে আছে?

প্রহ্লাদ তখন নিবিষ্ট চিত্তে হরিকে ডাকছে। স্তম্ভের ভিতর সে নীলকলেবর শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীবিষ্ণুকে দেখতে পেল। উল্লাসে জবাব দিল—হাঁ পিতঃ তিনি ঐ স্তম্ভের ভিতরেও আছেন. আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আপনিও তাঁকে ভক্তিবিহ্বল হয়ে ডাকুন, আপনিও দেখতে পাবেন।

হিরণ্যকশিপু হরিকে ভক্তি করবে? দারুণ আসুরিক দম্ভে তার সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা—অসুরজনোচিত ঘৃণায় তার বিকৃত মন নিয়ে সে হরিকে দেখবার ও হত্যা করবার জন্য স্তম্ভে পদাঘাত করল। —তৎক্ষণাৎ যেন বিস্ফোরণ ঘটল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সে অবাক হয়ে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অর্দ্ধনরাকার সিংহমূর্তি। মাথায় সিংহের মত কেশর—ব্যাদিত মুখে চকচকে দাঁতের সারি—জিহ্বা প্রলম্বিত। চার হাতে তীক্ষ্ণ নখর। গর্জন করতে করতে নৃসিংহ আসছে হিরণ্যকশিপুর দিকে। তারপর হিরণ্যকশিপু বধ।

এই যে নৃসিংহ মূর্তি দৈত্যরাজ দেখল, ভক্ত প্রহ্লাদ কিন্তু তাঁকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুরূপেই দেখছিল। দৈত্যরাজের দম্ভমোহযুক্ত বিকৃত মন যে হরিকে সৃষ্টি করল, পরিণামে যাঁর হাতে তার মৃত্যু ছিল, সেই হরিকেই ভক্ত প্রহ্লাদ কিন্তু অপূর্ব সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি রূপে দেখল। এখানেই "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" বাক্যটির সার্থকতা। হিরণ্যকশিপুও

এক অর্থে সাধক। তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে সে একাগ্র মনে হরিকে দেখতে চেয়েছিল। যেহেতু তার ইচ্ছাটা ছিল ঐকান্তিক, তাই তার মন ঐ ভয়ঙ্কর বীভৎস হিংস্র মূর্তিকে সৃষ্টি করেছিল।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

শুম্ভ নিশুম্ভের পীড়নে পীড়িত হয়ে দেবতাগণের স্তুতিতে মা মহামায়া কৌশিকীরূপে তাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সুষমা তাঁর অঙ্গে। কারণ দেবগণের দেবভাবের দ্বারা প্রমূর্তা সেই দেবী।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

অভীরুতা, পরবঞ্চনা ও মিথ্যা বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, সরলতা, তপস্যা, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ ইত্যাদি দৈবভাবে ভাবিত দেবতাগণের মনের দ্বারা প্রকাশিত শক্তিময়ী মা সর্বাঙ্গসুন্দর সুষমামণ্ডিত মূর্তিতেই তো প্রকাশিত হবেন। সেই মূর্তিতেই তিনি হিমালয়শৃঙ্গে বসে রইলেন। তারপর শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড সেই অপরূপাকে দেখল এবং শুম্ভ নিশুম্ভের প্রিয়পাত্র হবার আকাঙ্খায় তাদেরকে ঐ অপরূপার কথা শুধু যে বলল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের উত্তেজিত করল এই বলে যে তারা ত্রিলোকের যত ভালো ভালো বস্তু আছে সব কিছুরই অধীশ্বর, অতএব এই সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীও তাদের প্রাপ্য।

দম্ভ ক্রোধ ও মোহের প্রতিমূর্তি শুম্ভ আদেশ দিল, সেই নারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার প্রাসাদে আন—আর যদি স্বেচ্ছায় না আসে, চুল ধরে টেনে আন। দেবীর কাছে দূত গেল—দেবীকে শুম্ভ নিশুম্ভের ঐশ্বর্য শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বললে দেবী বললেন যে তিনি অল্প বুদ্ধির জন্য পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁকে যে যুদ্ধে হারাতে পারবে তিনি তারই পত্নী হবেন। দূত

তাঁকে অনেক বোঝাল কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা। দূতের মুখে এই কথা শুনে ৺ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল। বলল—তাকে চুল ধরে টেনে হোক, মেরে আধমরা করে হোক নিয়ে এস। দৈত্যগণ তখন প্রভুর কথামত দেবীকে আনতে গেল। তখনও ওরা দেখল দেবী সিংহের উপর বসে আছেন, অল্প অল্প হাসছেন। ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল দেবীর। তখনও—'দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্'। কিন্তু ওরা যখন দেবীর উপরে ক্রোধ করে ধনুকে বাণ জুড়ে অগ্রসর হল তখন তাদের মন পুরোপুরি অসুর-ভাবে আচ্ছন্ন হল। তখন তাদের মনে দুইটি ভাব। এক—দেবীকে আয়ত্ত করতেই হবে। দুই- কি উপায়ে? গায়ের জোরে। সমস্ত মন ক্রোধ আর দম্ভের প্রভাবে আচ্ছন্ন। দেবীকে আয়ত্ত করা সম্ভব কি না তা ভাবছে না। "আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ"—এই রকম মন নিয়ে অগ্রসর হওয়াতে তারা দেখল দেবীর মূর্তি বদলে যাচ্ছে- সেই হাস্যমুখী দেবীর ললাট থেকে বের হয়ে এলেন মৃত্যুরূপা কালী।

ভ্রুকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম।

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥

করালবদনা অসিপাশধারিণী চামুণ্ডা মূর্তি নির্গত হলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই দৈত্যগণের মানসিক বিকৃতির ফলে জাত।

মূলতঃ আদ্যাশক্তি সমগ্র জগৎ সৃষ্টিকারিণী মঙ্গলময়ী। তাঁকে মঙ্গলময়ী রূপে দেখতে হলে যে দেখবে তার মন দৈবীভাবে পূর্ণ হতে হবে। রাজসিকতা বা তামসিকতায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে তাঁকে মঙ্গলময়ীরূপে দেখা যায় না।

"যাশ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনা' ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ

পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ"

সুকৃতিযুক্ত মানুষের গৃহে যিনি লক্ষ্মীস্বরূপা, পাপাত্মা লোকের গৃহে তিনিই অলক্ষ্মী……।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।

সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে।

তিনি সম্পদে লক্ষ্মী হয়ে গৃহে আসেন আবার সেই সাত্ত্বিকতার অভাবে অলক্ষ্মীরূপে তাঁর প্রকাশ। শক্তির এই যে বিপরীতধর্মী প্রকাশ, এ শক্তির স্বভাবে নয়। এটা হল যে প্রত্যক্ষ করে তার স্বভাবদোষে বা গুণে হয়। মানুষ নিজের মনকে যেভাবে প্রস্তুত করবে, দেবতার দর্শনও সেই ভাবেই হবে। কারণ ঈশ্বরে ক্ষোভ নাই, বিক্ষেপ নাই। যে দেখে তার ক্ষোভ বিক্ষেপই নানাভাবের মূর্তি সৃষ্টি করে। দর্পণে বাহিরের দৃশ্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যতক্ষণ দর্পণ অবিকৃত অমলিন থাকে। সেই দর্পণের মধ্যেই যদি ফাটা চিহ্ন থাকে বা কালি মাখিয়ে দেওয়া যায় তবে বাহিরের প্রকৃতির দৃশ্য অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ছায়া বিকৃত হয়ে যেতে বাধ্য।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন আছে। শ্রীকৃষ্ণের বহু উপদেশের পর অর্জুনের মন শান্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ যে তার কর্তব্য একথাও বুঝতে পারছে। তবুও সংশয় ঘুচছে না। ফলে হল বিশ্বরূপদর্শন। কিন্তু এই দর্শন সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায় - বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছুই অর্জুনেব দৃষ্টিগোচর হল। আদিহীন মধ্যহীন অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের বহু কিছুই অজুন দেখছেন। কিন্তু দেখছেন—

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

হে দেবেশ, দীর্ঘ দন্তদ্বারা ভয়ঙ্কর ও প্রলয়াগ্নিতুল্য আপনার মুখ সকল দেখে আমার সব বিষয়েই ভ্রম হচ্ছে। আমি শান্তি পাচ্ছি না……।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥

বক্ত্রানি তে ত্বরমাণা বিশন্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং আমাদের পক্ষের যোদ্ধৃগণ, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ সকলেই আপনার ঐ দংষ্ট্রাকরাল মুখের ভিতর প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক চূর্ণ হয়ে গিয়ে আপনার দাঁতের ফাঁকে আটকে আছে।

অর্জুন এমনই ভয়ানক দৃশ্যসকল দেখছেন। দেখে ভয় পাচ্ছেন। প্রশ্ন এই যে বিশ্বস্বরূপ বলতে কি বোঝায়? বিশ্বে কি কেবলই ভয়ানক রূপ? এত শোভা এত সৌন্দর্য বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অন্তরে প্রেম ভালবাসা বাৎসল্যরূপে, বাহির জগতের অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে —এসব কি বিশ্বরূপের মধ্যে ধরা হবে না? ভগবান কি কেবল এই ভয়াল রূপই দেখাচ্ছেন? তা তো নয়, কিন্তু অর্জুন কেবলই শ্রীকৃষ্ণের দেহে ভয়ানক রূপই দেখছেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো।

নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।

হে উগ্ররূপ, দেবশ্রেষ্ঠ, আমার প্রণাম লও, প্রসন্ন হও, তুমি কে আমাকে তাই বল।

ভগবানের উত্তর আরও সাংঘাতিক—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, এখন লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

অর্জুন এসেছিলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং ধ্বংসলীলার বীভৎস রূপ তাঁর মনে ছিল। সাময়িক বৈকল্যবশে পিছিয়ে আসতে চাইলেও তাঁর মনে ছিল, কেউ কোনও প্রেরণা দিয়ে তাঁর সেই ম্রিয়মান শৌর্যকে

উদ্দীপিত করুক। তাই তাঁর মন ভগবানের ঐ ধ্বংসমুখর ভয়াল রূপকেই দর্শন করল। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" কথাটির অর্থবহতা সার্থক হয়ে উঠল। সেই জন্যই অর্জুনের দৃষ্ট বিশ্বরূপের মাঝে বিশ্বের সুন্দর প্রেমঘন মূর্তির ঠাঁই হয় নি. তিনি শুধু ভগবানের উগ্র রূপকেই দেখলেন।

অর্জুনের এই মানসিকতার পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি থেকে পাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগে শ্রীভগবান্ বললেন -

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

মোক্ষযোগ ৫৯/৬০

অহঙ্কারকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করব না বলে যা মনে করেছ, তোমার ঐ নিশ্চয় উক্তি ভ্রমমূলক। তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে। হে কৌন্তেয়, অজ্ঞানতা বশতঃ যা করব না মনে করছ স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই তুমি করতে বাধ্য হবে।

এই শ্লোকদ্বয়দ্বারা ভগবান্ অর্জুনের মনকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবং এই মানসিক বিশ্বরূপ দর্শনে যা স্বভাবজাত ছিল তাই ঘটেছিল। অর্থাৎ যে দৃশ্য দেখলে তাঁর আর যুদ্ধে আপত্তি না থাকে তাই দেখলেনও।

এমনিভাবে ইষ্টরূপে ঈশ্বরের দর্শনেচ্ছু ভক্তের মানসিক একাগ্রতা, তার আগ্রহ, তার রুচিভেদ অনুসারে সেই বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্মেরও রূপ পরিকল্পনা এবং পরিগ্রহ হয়। শুধু ভক্ত বা সাধক নয়, একাগ্রভাবে পরম অধ্যবসায় সহকারে শত্রুরূপে ভজনা করলেও তাঁকে সেই শত্রুরূপেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

তবে একথা তো অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যে ভাবেই ইষ্টকে ভজনা করি না কেন, সিদ্ধ সাধকগণের প্রদর্শিত পথে অনন্যমনা হয়ে অগ্রসর হতে

হবে। কোনও অধীত বিষয় আয়ত্ত করতে হলেও মনের একাগ্রতা প্রয়োজন। আর ব্রহ্মকে রূপযুক্ত করে দর্শন করতে হলে মনের একাগ্রতার পথে বিক্ষোভ আর চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে অগ্রসর হতে হবে। সাধকগণ প্রদর্শিত সাধনভজন, স্তবমন্ত্রাদি পাঠ, প্রাণায়াম, যোগ প্রভৃতি সেই উপায়। ঐ উপায় দিয়েই মনের ব্যাপকত্ব সংকীর্ণ করে এক কেন্দ্রবিন্দুতে আনা যায়। যাবতীয় পূজা, জপ, যজ্ঞ স্তবপাঠ সব কিছুই শেষ ফল ব্রহ্মজ্ঞতা লাভের জন্যই উপায় মাত্র। মনস্থির করবার পথ। যে মহানির্বাণতন্ত্র বহু পূজা এবং নানাবিধ যোগসাধনের উপায় বর্ণনা করেও শেষে বলেছেন—

বালক্রীড়নবৎ সর্বং রূপাণামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ।।
মনসা বন্দিতা মূর্তিঃ নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ।।

ব্রহ্মের নাম রূপ প্রভৃতি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বালক্রীড়া ত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা ।।

ব্রহ্মই সত্য আর সবই মিথ্যা এই ভাবই উত্তমকল্প। ধ্যানভাব মধ্যমকল্প স্তব-জপভাব অধম আর বহিঃপূজা অধমেরও অধমভাব।

এই চরমভাবের পূর্বেই সমস্তটুকু গ্রন্থের মধ্যে নানাবিধ পূজা ব্রত নিয়মের ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান্ সদাশিব। কেন করেছেন তাও বলেছেন—

যদ্যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্বং সবিশেষং প্রকীর্তিতম্ ।।
বিনা কর্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্মবায়ুনা ।।
কর্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কর্মণো বশাৎ ।।
ততো বহুবিধং কর্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ।।

অর্থ ঃ কর্ম না ক'রে কোনও মানুষ ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তারা কর্ম করতে অনিচ্ছুক হলেও বিবশ হয়ে কর্মরূপ বায়ু কর্তৃক আকৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। মানুষেরা কর্মদ্বারাই সুখ ভোগ করে আবার কর্মদ্বারাই দুঃখ ভোগ করে। কর্মবশেই তারা জন্মগ্রহণ করে, কর্মদ্বারাই শরীর ধারণ করে আবার কর্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্যই আমি অল্পবোধযুক্ত মানুষের সৎপ্রবৃত্তি লাভের জন্য এবং দুষ্প্রবৃত্তি নাশের জন্য বহুবিধ সাধন এবং বহুবিধ কর্মের কথা বললাম।

এই বহুবিধ সাধন ও বহুবিধ কর্ম সাধারণ মানুষের ঈশ্বরোপলব্ধির পথ নির্দেশ। রুচিভেদে, সামর্থ্য ভেদে ও অধিকারভেদে এই বহুবিধ সাধনের ও কর্মের যে কোনটি আশ্রয় করেই জ্ঞানমার্গে উত্তীর্ণ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই উপাসাভেদ স্বীকৃত। মানুষের মনস্তত্ত্ব ও প্রবণতার সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্লেষণেই এই পন্থা আবিষ্কৃত।

শিবলিঙ্গ কি ও কেন ?

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবলিঙ্গের পূজা আজও প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের নানা তীর্থে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ অনেক কয়েকটি আছে। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সংখ্যা গণনা অসম্ভবই। অমরনাথের তুষারলিঙ্গ স্বয়ম্ভূলিঙ্গের এক বিস্ময়কর উদাহরণ।

শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্তন কারা করেছিল, কি অর্থে করেছিল এ নিয়ে ইতিহাস গবেষকগণ থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বিশারদগণ সকলেই অনেক গবেষণা করেছেন এবং প্রায় সকলেই এক বিষয়ে একমত হয়েছেন যে আদিমতম মানবসমাজ থেকে পরবর্তী সভ্য সমাজেও জীবসৃষ্টি ও শস্য উৎপাদনের বিস্ময় সৃষ্টিকার্যের প্রত্যক্ষ আলোকে উদ্‌ভাসিত মানুষের মনকে বিস্ময়াপ্লুত করেছিল। তারা বুঝেছিল যে শস্য উৎপাদনে যেমন ক্ষেত্র, কর্ষণ ও বীজের প্রয়োজন হয়, জীবসৃষ্টির ব্যাপারেও অনুরূপ ক্রিয়া ও উপাদানের প্রয়োজন। জীবসৃষ্টির মত মহান্ কর্মের নির্বাহ যার দ্বারা হয় সেই স্ত্রীযোনি ও পুরুষের শিশ্ন এই দুই-এর সমাহার পবিত্রতা লাভ করে পূজ্য হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতেই এই শিশ্ন-যোনির পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করেই অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। শিবলিঙ্গ পূজা এরই প্রত্যক্ষরূপ। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে নানা সংঘাত ও দ্বন্দ্বে এই পূজার অবলোপ হলেও ভারতবর্ষে বড় রকমের ধর্মবিপ্লব না হওয়াতে এই পূজা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। শিবলিঙ্গের গঠন এবং গৌরীপট্টের সঙ্গে সংযোগ এই মতবাদ প্রচারের সহায়তা করেছে। পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত Phalic worship ছাড়া শিবলিঙ্গ পূজা আর কিছুই নয়।

এই মতবাদ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজা সম্বন্ধে একথা খাটে না। শিবলিঙ্গের যথার্থ অর্থ, ইতিহাস ও

প্রবর্তনের মানসিকতা —এগুলির যথার্থ বিশ্লেষণ হলে এই পূজার আদি রূপ এবং পরবর্তী বিকৃতির রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হতে পারে।

এই বিষয়ে আলোচনার আগে Phalic worship-এর ইতিহাস কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রীস এবং মিশরের পুরাবৃত্তের ইতিহাসে এই ফ্যালাস পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ফ্যালাস শব্দের অর্থ পুরুষের শিশ্ন। বলা হয়েছে টাইফন কর্তৃক অসিরিস নিহত হলে তার পত্নী আইসিস অসিরিসের খণ্ড খণ্ড করে ফেলা মৃতদেহটি নিয়ে আসে। সমস্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক জায়গায় করে আইসিস দেখল অসিরিসের জননেন্দ্রিয়টি পাওয়া যাচ্ছে না। এই না পাওয়াতে আইসিস ঐ অপ্রাপ্ত অঙ্গটির উপরেই গুরুত্ব দিলেন। এবং কাঠ দিয়ে একটি পুরুষাঙ্গ তৈরী করলেন। অসিরিসের উদ্দেশ্যে তিনি এক উৎসব প্রবর্তন করলেন -তার নাম দিলেন ফ্যালিকা। ঐ উৎসবে ঐ কাঠের শিশ্নটি প্রকাশ্যে বের করে প্রদক্ষিণ করা হত আর লোকে নানারকম মানত করত। ঐ Phallus পূজা হত বলে উৎসবের নাম হল ফ্যালিকা ফেস্টিভ্যাল। গ্রীসের এই পূজা মিশরীয়দের অনুকরণে প্রবর্তিত হয়। পরে এথেন্সবাসীদের দ্বারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ভাবেই Phalic worship প্রবর্তিত হয়। তারপর তার সঙ্গে হলকর্ষণ বীজবপন প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি এসে সংযুক্ত হয়।

কিন্তু ভারতে শিবলিঙ্গ প্রবর্তন ও পূজার আদি ইতিহাস অন্য রকম। মোটেই মিশর বা গ্রীসের মত নয়। কাজেই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং তদনুসারী এদেশীয় পণ্ডিতগণের এই মতবাদ ভ্রান্ত। ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গ পূজার আদি ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য সাক্ষ্য দেয়। এই হিসাবে বলা যায় শিবলিঙ্গ পূজা Phalic worship নয়, এবং একদেশদর্শী পণ্ডিতগণের মতবাদ ভ্রান্ত।

এখন এক এক করে রহস্যের যবনিকা উদ্ঘাটিত করা যাক। প্রথমেই বলা যাক-

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ কি—

বৈদিক ভাষাকে সংস্কার করে যে নূতন ভাষাপ্রণালী প্রচলিত হল তার নাম হল সংস্কৃত। অবশ্য কালের প্রবাহে অবশ্যম্ভাবীরূপে এই ভাষারও সংস্কার, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত ভাষাতে লিঙ্গ শব্দের অর্থ ছিল সূক্ষ্ম, প্রতীক বা চিহ্ন। সূক্ষ্ম শরীর অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়— লিঙ্গ শরীর। এর দ্বিতীয় কোন অর্থ ছিল না। কোনও শব্দ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ এই আখ্যা দেবার অর্থ এই যে ঐ শব্দটি ব্যাকরণগতভাবে পুং বা স্ত্রী বাচক। বস্তুনিরপেক্ষভাবেই শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যেমন বৃক্ষ শব্দ পুংলিঙ্গ আবার নদী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ তার মানে এই নয় যে বৃক্ষের বা নদীর পুং বা স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আছে। চরকসংহিতা অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি আত্রেয় কথিত এই গ্রন্থে ভরদ্বাজ প্রভৃতি শিষ্য। এই গ্রন্থের জ্বরের কিছু লক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে—এই এই সব লক্ষণগুলি আমজ্বরের লক্ষণ —"আমজ্বরস্য লিঙ্গানি, ন দদ্যাৎ তত্র ভেষজম্।" এখানে ঔষধ দেবে না।

আর একটি চিকিৎসা গ্রন্থে আছে -

সোপদ্রবারিষ্টনিদানলিঙ্গম্
নিবধ্যতে রোগবিনিশ্চয়োঽয়ম।

অর্থাৎ রোগসমূহের উপদ্রব, অরিষ্ট, নিদান অর্থাৎ হেতু এবং লিঙ্গসমূহ অর্থাৎ লক্ষণসমূহ সমেত এই গ্রন্থে রোগনির্ণয় পদ্ধতি বলা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—লক্ষণ বা চিহ্ন হিসাবেই লিঙ্গ শব্দটির ব্যবহার। সংস্কৃত ভাষায় পুংজননেন্দ্রিয় বোঝাতে শিশ্ন, মেঢ্র, শেফ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, লিঙ্গ কদাচ নয়।

এই আদি সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারের প্রবর্তন থেকে পুরাণ উপপুরাণ রচনার ব্যবধান অবশ্যই কয়েক শতাব্দী। এই পুরাণ উপপুরাণেই লিঙ্গ শব্দের অর্থবিকৃতি ঘটান হয়েছিল। স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, শিব সংহিতা, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রকারের অর্থ গ্রহণ করেছে।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তিকাল

ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত আর্যজাতি, যখন তাদের যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে বর্তমান ছিল তখন ভারতবর্ষে এক বৃহৎ অংশে আর্যেতর বহু জাতি বাস করত। আর্যগণের সঙ্গে তাদের নানা বিষয়ে সংঘাত সৃষ্টি হত। আর্যগণ ঐ সব সম্প্রদায়কে রাক্ষস, দানব, যক্ষ, নাগ, ঋক্ষ, বানর পক্ষী প্রভৃতি নামে অভিহিত করত। এদের ধর্মাচরণে বেদের কোনও স্থান ছিল না। এদের সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের সমাজে যে ধর্মমতের প্রচলন ছিল তা নিশ্চয়ই কোনও আর্যেতর ভাষায়।

তাদের এই ধর্মমত হল তন্ত্রধর্ম। এই ধর্ম তাদের সমাজযাত্রা এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই প্রস্তুত হয়েছিল। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন মহাযোগী মহাদেব বা শিব। ইনি কিন্তু বেদের রুদ্র নন। ইনি যোগশাস্ত্র, নৃত্যগীতাদি, চিকিৎসাশাস্ত্র সব বিষয়েই অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। এঁর মত এতো গুণ ও বিদ্যাসম্পন্ন কোনও মানব বেদানুসারী সম্প্রদায়েও দেখা যায় না। সমস্ত আর্যেতর মহাদেব প্রবর্তিত তন্ত্রধর্মকেই আশ্রয় করেছিল। কারণ তন্ত্র তাদের সামাজিক আচাররীতি মেনেই প্রবর্তিত হয়েছিল। তাদের সমাজে যে প্রথা চলত তন্ত্র তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের মনকে ঈশ্বরমুখী করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। অবশ্য তখন এই মতের নাম কি ছিল আজ বলা কঠিন। তন্ত্র নামটি পরবর্তী যুগে গৃহীত হয়। কালের অমোঘ নিয়মে এই মহাযোগী মহাদেবেরও একদিন জীবনাবসান হয়েছিল। অবশ্যই তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ ও অনুরাগিবৃন্দ তাঁর প্রবর্তিত তন্ত্রমতের অনুশীলন করেই যাচ্ছিল। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নিশ্চয়ই হচ্ছিল।

মানুষের স্বভাব এই যে যাঁকে ভক্তি করা যায়, হৃদয়ের আসনে শ্রদ্ধার পদ্মদলে যাঁকে বসান যায়, তাঁর শরীরের অন্তর্ধান মনকে পাড়া দেয়। এই আকাঙ্খা আজও মানুষের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান। সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই মহাপুরুষগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ঝোঁক দেখা যায় এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করে।

মহাদেব শিব চোখের সামনে নেই অথচ তাঁর প্রবর্তিত তন্ত্রমার্গ অনুসরণ করে অনেকেই অধ্যাত্ম মার্গের উচ্চস্তরে উঠে যাচ্ছে। তন্ত্রের প্রভাব ক্রমে বিস্তার লাভ করছে। আর্যগোষ্ঠীর মানুষেরাও ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছে তন্ত্রের দিকে। কারণ বেদের কর্মকাণ্ডে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকারহীনতা জনমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। যজ্ঞাদিও ক্রমে বিশেষজ্ঞদের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ সাধারণ মানুষ যার মধ্যে স্ত্রী শূদ্র এবং বেদে পারঙ্গম নয় এমন মানুষ ছিল যারা তাদের অধ্যাত্মপিপাসা মিটাতে পারে এমন মতবাদের অভাব অনুভব করছিল। আর্যেতরগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের মেলামেশা ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহাদিও হচ্ছিল। ধীরে ধীরে আর্য-গোষ্ঠীর অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছিল সহজ ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো তন্ত্রাচারের দিকে। স্ত্রী শূদ্র সবারই যাতে অধিকার আছে, অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যার প্রয়োজন যেখানে তেমন নাই যজ্ঞের দেবতাদের আহ্বান নাই। ঈশ্বর যেখানে মানব আত্মীয়ের মত পূজা গ্রহণ করেন। আর্যদের আকৃষ্ট করে তন্ত্র তখন নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। অনূদিত হল সংস্কৃত ভাষায়। তখন অভাব অনুভূত হল তন্ত্রপ্রবক্তা মহাদেবের। যেহেতু তিনি সশরীরে তখন ভক্তদের মধ্যে উপস্থিত নাই কাজেই নির্মিত হল তাঁর প্রতীক চিহ্ন। এই প্রতীকই হল শিবলিঙ্গ।

প্রতীকের আকৃতি এমন হল কেন

যে সময়ে এই প্রতীক নির্মিত হল সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিমা গড়বার রীতি প্রবর্তিত হয় নাই। সমসাময়িক বেদেও প্রতিমা গড়বার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। কাজেই অনুকল্প গৃহীত হল ঐ প্রতীক নির্মাণের ক্ষেত্রে। মহাদেবের যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তির প্রত্যক্ষদর্শন হয়েছে এমন কিছু শিষ্য হয়ত তখনও জীবিত ছিল। তাদের বর্ণনামত শিবের যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিই অনুকল্প হিসাবে নেওয়া হল। সেই মূর্তি ঠিক মূর্তি নয়, প্রতীক মাত্র। মনে করা যাক নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন আসনে দুই হাঁটু মুড়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট মহাদেব। দুই হাত কোলের উপর রাখা। পিঠ ঘাড় মাথা এক সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত। মাথায় জটাভার চূড়া করে বাঁধা—

এমনই একখানা রেখাচিত্র যদি আঁকা যায় এবং ছবিটিকে কালি লাগিয়ে সিলুয়েটের আভাস আনা যায় তবে যে আকৃতি আসবে সেই আকৃতিই প্রতীক হিসাবে গৃহীত হল। এই অনুকল্প প্রতীক পাথর বা বালুকা যার দ্বারাই নির্মিত হোক না কেন, আযেতর জাতি নির্মিত এই প্রতীকই হল ভারতবর্ষের আদিমতম প্রতিমা। সংস্কৃতে যার নাম দেওয়া হল শিবলিঙ্গ।

পরবর্তী কালে যখন তন্ত্র পূর্ণভাবে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তখন মহাদেবের এই মূর্তির বর্ণনাও সংস্কৃতে হয়েছে। মহাদেবের এই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মূর্তিই সবত্র পূজিত হয়েছে। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের চমৎকার আলেখ্য দিয়েছেন—

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম ॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ।
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম ॥

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে পূর্বদেহ স্থির করে ঋজু ও সরলভাবে বসে আছেন। তার স্কন্ধদ্বয় সন্নত হয়ে পড়েছে। তার দুখানা করতল কোলের উপর উত্তানভাবে রাখা আছে তাতে মনে হচ্ছে দুটি ফোটা পদ্ম তার কোলের উপর আছে। তার জটাগুলি ভুজঙ্গ দিয়ে বাধা ঊর্ধ্বে চূড়াকারে, কানে রুদ্রাক্ষমালা লাগান, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম উত্তরীয়ের মত করে গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ, নীলকণ্ঠের সহজ প্রভা যেন আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। ত্রিনেত্রের তারকাত্রয় নাসিকাগ্র লক্ষ্য করছিল, তারকাগুলি অল্প প্রকাশিত ছিল। তখন তিনি দেহমধ্যস্থ বায়ুগণকে নিরুদ্ধ করেছিলেন এইজন্য তাকে বৃষ্টির আড়ম্বরশূন্য মেঘ অথবা তরঙ্গবিরহিত সমুদ্র অথবা বায়ুশূন্য স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের মত বোধ হচ্ছিল।

এই ভাবের ধারণাতেই মূর্তির অনুকল্প যে মূর্তির প্রতীক তৈরী হল তাকেই সংস্কৃত ভাষায় বলা হল শিবলিঙ্গ। অবশ্যই অনার্য ভাষায় এই লিঙ্গের কি নাম হয়েছিল তা আমাদের জানা নাই। কারণ সংস্কৃতের ভাষায় তন্ত্রের কোন বই পাওয়া যায় নাই।

এই শিবলিঙ্গের নির্মাণ হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে। ত্রেতাযুগে রাক্ষসাধিপ রাবণ এই শিবলিঙ্গ পূজা করতেন। তাহলে মহাদেবের দেহাব-সানের কাল তারও অনেক আগে। শিবলিঙ্গের প্রবর্তন পুরাণ উপপুরাণ রচনার অনেক আগে হয়েছিল। বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় রাবণ সোনা দিয়ে এই শিবলিঙ্গ নির্মাণ করেছিলেন।

যত্র যত্র হি যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
জাম্বুনাদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে।
বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং সংস্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ।
ততঃ স তং মূর্তিধরং বরং হরং
বরপ্রদং চন্দ্রকিরীটভূষণম্।
তমর্চয়িত্বা নিশাচরো জগৌ
প্রসার্য হস্তাংশ্চ ননর্ত সোইগ্রতঃ॥

রাবণ যেখানে যেখানে যেতেন, স্বুবর্ণময় শিবলিঙ্গ সেখানে সেখানে নিয়ে যেতেন। মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়ে রাবণ কার্তবীর্য্যাজুনের সাক্ষাৎ না পেয়ে নর্মদা নদীতীরে বালুকার বেদীর উপরে চন্দ্রকিরীটভূষণ বরপ্রদ হরের লিঙ্গ স্থাপন করে অমৃতসুগন্ধি গন্ধপুষ্প দিয়ে শিবের পূজা করে হাত প্রসারিত করে নাচতে লাগল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাবণের রাজত্বেরও আগে শিবের লিঙ্গমূর্তির ব্যবস্থা হয়েছিল, অর্থাৎ মহাযোগীর দেহাবসান হয়েছিল। এবং রাবণ মহাদেবের লিঙ্গমূর্তিই পূজা করতেন। এবং সেই লিঙ্গমূর্তিকে চন্দ্রকিরীটভূষণ বরপ্রদ হর বলেই মনে করতেন।

ঐ সময়েই রামচন্দ্রও শিবলিঙ্গ পূজা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গই রামেশ্বর সেতুবন্ধের শিবলিঙ্গ।

অর্থবিকৃতি কবে হল? কেন হল?

শিবলিঙ্গ প্রবর্তিত হবার পর যখন তন্ত্রসমূহ স ষ্কৃতে রূপান্তরিত হল তারও অনেক পরে পুরাণসমূহ রচিত হয়েছিল। কয়েকটি পুরাণে লিঙ্গ শব্দের অর্থচ্যুতি ঘটান হল, সঙ্গে সঙ্গে তথ্যে পরিবর্তনও ঘটান হল। শিবলিঙ্গের মাথায় দুধ জল মধু ঘৃত প্রভৃতি ঢাললে যাতে জমে না থেকে বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য জানু ও আসনের ভাঁজে যে খাঁজ কাটা হয়েছিল তাকে গৌরীপট্ট বা যোনি কল্পনা করে উর্ব্বাংশকে শিবশিশ্ন কল্পনা করা হল। এই বিকৃত কল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে প্রস্তুত শিবলিঙ্গের আকারও কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তী কালের তন্ত্রের মধ্যেও অনেক ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল। ফলে অর্থবিকৃতি চূড়ান্তরূপ নিতে বাধা পায় নাই। এবং শিবলিঙ্গের প্রথম ধারণা পরিবর্তিত হয়ে শিবশিশ্ন ও গৌরীযোনির সমাহার পূজা বলেই ব্যাখ্যাত হতে লাগল। এই অর্থ এবং তথ্যবিকৃতি ঘটাতে স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বামনপুরাণ, শিবসংহিতা এবং নারদপঞ্চরাত্র এই কয়েকখানি গ্রন্থই অগ্রণী ছিল। সব পুরাণই ব্যাসদেবের রচনা বলে চালান হয়। কিন্তু এই ব্যাস আর যেই হোন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে নন একথা নিশ্চিতই বলা যায়।

কালিকাপুরাণে (যাকে মূল অষ্টাদশ "পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, উপপুরাণ বলা হয়) কিন্তু মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি সম্বন্ধে আদি লিঙ্গ নির্মাণের সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যান বলা হয়েছে। সতীর দেহত্যাগের পর সতীদেহ কাঁধে নিয়ে মহাদেব উন্মত্তের মত ত্রিভুবন পরিক্রমা করতে লাগলেন। সে সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনৈশ্চরের চেষ্টায় সতীর দেহকর্তিত হয়ে এক এক অঙ্গ এক এক স্থানে পড়তে লাগল। মহাদেব প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে যখন দেখলেন যে নিজের কাঁধ ভারশূন্য হয়ে গেছে তখন যেখানে সতীর মস্তক পড়েছিল সেইখানে শোকাতুর হয়ে বসে পড়লেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবগণ দূর থেকে মহেশ্বরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এগিয়ে এলেন। মহাদেব তখন লজ্জা পেলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, শোকদুঃখের অতীত এই তো সবাই বলে। তিনি কেন শোকে উন্মত্ত হবেন। এই লজ্জায় তিনি

দেহ অবসান করে প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করে সেখানেই অবস্থিত হলেন। তখন দেবগণ সেই লিঙ্গরূপী মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন। সেই অবধি লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হল। এই প্রস্তরী ভূত প্রতীকই শিবলিঙ্গ। কালিকা-পুরাণ এই আখ্যানে অন্তত লিঙ্গের অপব্যাখ্যা করেন নাই। বরং যথার্থ অর্থের দিকেই নির্দেশ করেছেন। অবশ্য স্কন্দপুরাণে শিবলিঙ্গ বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন –

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥

আকাশের নাম লিঙ্গ, পৃথিবী তার পাঠিকা। এই আকাশ সর্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান, এই কারণে আকাশকে লিঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়।

আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্তি ও সকলের লয়স্থান। কিন্তু এই ব্যাখ্যা করেও স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে বিবরণ লিখিত হয়েছে তাতে লিঙ্গ শব্দের অর্থবিকৃতির দায় থেকে স্কন্দপুরাণও রেহাই পান না। অন্য পুরাণগুলি তো অত্যন্ত বিকৃত কাহিনী পরিবেশন করেছেন। এবং এই পুরাণগুলি অনুসরণ করে চিন্তাধারাকে সেই দিকে প্রবাহিত করলে শিবলিঙ্গ পূজা Phalic worship হিসাবেঃ বলা যায়।

এই লিঙ্গ যে শিশ্ন নয় তার আরও কিছু প্রমাণ—

শিবলিঙ্গ দুই রকমের হয়, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গ হল অকৃত্রিম, অর্থাৎ প্রকৃতিজাত। আর ধাতু প্রস্তরাদিদ্বারা নির্মিত লিঙ্গ হল কৃত্রিম। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পাঁচ রকমের হয়—

পঞ্চধা তৎ স্থিতং লিঙ্গং স্বয়ম্ভু-দৈব-গোলকম্।
আর্ষঞ্চ মানসং লিঙ্গং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥

এই সমস্ত লিঙ্গের আকার সম্বন্ধে যে সব বিবরণ ও চিহ্নাদি বর্ণিত আছে তা কখনই শিশ্নাকারের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। গোল, কুষ্মাণ্ডাকার, নারিকেল ফলের মত আকার অথবা ত্রিশূল চিহ্নিত, শঙ্খ চিহ্নিত এরকম নানা বিবরণ দেখা যায়। এ সমস্ত দেখে সহজেই অনুধাবন করা যায়—

অকৃত্রিম লিঙ্গকে কখনই শিশ্নরূপে কল্পনা করা হয় নাই। কৃত্রিম লিঙ্গেরও অর্থবিকৃতি ঘ৴ানোব পবেই আকার পবিবর্তন কবা হযেছে।

বাণলিঙ্গও অকৃত্রিম লিঙ্গ।

নর্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্।

নর্মদাব জলেব মধ্যে জলেব স্রোতে প্রস্তব ঘর্ষণেব ফলে এই অকৃত্রিম সচল লিঙ্গ অর্থাৎ বাণলিঙ্গ উৎপন্ন হয। এবং এই সকল বাণলিঙ্গেব আকৃতি মোটেই শিশ্নযোনিব সমাহাবেব মত নয—প্রাযই ডিম্বাকাব হয। স্বযম্ভু-লিঙ্গেব একটি বিশেষ উদাহবণ অমবনাথ গুহাব তুষাবলিঙ্গ, যা অল্প অল্প কবে বাড়তে বাড়তে শ্রাবণী পূর্ণিমায পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয। এটি আমাদেব বর্ণিত শিবলিঙ্গেব আদিরূপেব আকাব।

উপসংহাব

শিবলিঙ্গ পূজাব মন্ত্রে সর্বদাই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মহাযোগী মহাদেবেব বর্ণনা উল্লেখ কবে পূজা কবা হয। কুত্রাপি শিশ্নযোনিব সমাহাবেব কথা উল্লিখিত হয না।

সম্পূর্ণ বিশ্লেষণেব পব এই সিদ্ধান্তে আসা যায যে—

(১) শিবলিঙ্গ প্রবর্তনেব আদিকালে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মহাযোগী মহাদেবের মূর্তিই শিল্পীব মনে প্রেবণা দিযেছিল। কাবণ তখনও যথাযথ প্রতিমা নির্মাণেব প্রচলন হয নাই।

(২) কখনই শিশ্নযোনিব সংযোগ হিসাবে শিবলিঙ্গ কল্পিত হয় নাই। কাজেই একে কিছুতেই Phalic worsh'p বলা যায না।

(৩) পববর্তী কালে পুবাণকাবেবা লিঙ্গেব জানু ও আসন মিলিযে গৌরী পট্টেব পরিকল্পনা এবং উপবিভাগকে শিবশিশ্ন কল্পনা কবেছিলেন। এইভাবে অর্থবিকৃতি ঘটিযে সর্বনাশ ঘটান হযেছে। পববর্তী যুগে মঙ্গলকাব্য বচয়িতাবা আবও বিকৃতি ঘটিযেছেন।

(৪) পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং তদনুসাবী এদেশীয় পণ্ডিতগণ পুরাণকারদের মতকেই গ্রাহ্য করে শিবলিঙ্গ পূজাকে Phalic worship বলেছেন। তাঁরা কেউই মূল চিন্তার দিকে অগ্রসব হন নাই।

(৫) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম প্রতিমা হল এই শিবলিঙ্গ। যখন যথাযথভাবে প্রতিমা নির্মাণের বিধি অনুসৃত হত না সেই সময়ে যে প্রতীকী প্রতিমা নির্মিত হয়েছিল, তাই হল এই শিবলিঙ্গ।

প্রতিমা পূজা কি পৌত্তলিকতা

ইসলামধর্মাবলম্বিগণ ও খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণ হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলেন, যেহেতু হিন্দুরা প্রতিমাতে ইষ্টের পূজা করেন।

আবার মূলতঃ হিন্দুধর্মাশ্রিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ধারণা প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মসম্প্রদায় এবং আর্যসমাজের অনুগামিগণ প্রতিমা পূজাকে পুতুল পূজা বলেন। কিন্তু গোড়াতেই সকলেই একটি ভুল কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। হিন্দুগণ পুতুলকে পূজা করেন না। পুতুলকে পূজা করাই যদি তাদের সাধনা হত তবে বহুদিন আগেই নানা ধর্মের সংঘাতে ঐ পূজা লোপ পেত।

খৃষ্টপূর্বকালে রোমানগণ, গ্রীকগণ পুতুল পূজা করত। তাদের বিরাট বিরাট মন্দিরে তাদের দেবতাগণ যথা জুপিটার, অ্যাপোলো, ভেনাস, জুপিটার পত্নী আইও প্রভৃতির যে প্রস্তরমূর্তি ছিল, পুরোহিতদের কারসাজিতে যন্ত্রপ্রক্রিয়ার সাহায্যে তাদের মুখ থেকে প্রত্যাদেশ নির্গত হত। সাধারণ মানুষ ঐ জীবন্ত মূর্তির প্রত্যাদেশ শুনে ঐ মূর্তিগুলিকেই দেবতা মনে করত। কালক্রমে খৃষ্টধর্মের জোয়ার যখন এল তখন বলবান খৃষ্টান পক্ষ ঐ সব মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। মূর্তি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিষয় সর্বসাধারণের নয়ন এবং মনের গোচরে এল। প্রথমে তারা দেখল ঐ মূর্তিগুলোর মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়া কৌশলের সাহায্যে পুরোহিতেরা ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে লোককে প্রত্যাদেশ শুনিয়ে ভাঁওতা দিত। মূর্তি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সেই অপকৌশল ধরা পড়ল। দ্বিতীয় ব্যাপার যা প্রত্যক্ষ হল তা ঐ সব জীবন্ত দেবতাগণ ধ্বংসকারীদের শাবল গাঁইতির আঘাত প্রতিরোধ করতে পারলেন না। ফলে দৃশ্যতঃ এবং মনোগতভাবে এই সব দেবতার পুতুল

আখ্যা প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটল না। ইসলাম প্রবর্তনের আগে কাবা মসজিদ আদিতেও ঐ ধরনের পূজাই হত। জঙ্গী মুসলমানদের আঘাত সেখানেও ঐ বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনের দীর্ঘ শতাব্দীগুলির ব্যাপ্তিতে হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি কম চূর্ণ হয় নাই, তবুও ইসলাম শাসনের অবসানের পর দেখা গেল ভারতবর্ষে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার কারণ হল রোম বা আরবের মত ভাঁওতা দেওয়া ধর্মনীতি হিন্দুদের ছিল না। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। চৈতন্যময় সর্বব্যাপী ঈশ্বরের ভজনাই করে, মনঃসংযোগের জন্য সিদ্ধ সাধকগণের প্রদর্শিত পথে কোনও প্রতিমাকে সামনে রেখে। প্রতিমাটা এখানে মুখ্য নয়। সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিই মুখ্য, প্রতিমা গৌণ অবলম্বন মাত্র। তারা জানে, এখন যে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা করছে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে নানা উপচার সাজিয়ে, পর দিনই তা বিসর্জন দেওয়া হবে নদীগর্ভে। কারণ মন্ত্রবলে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল, আবার মন্ত্রবলেই তা মাটির পুতুলে পরিণত হয়েছে। কাজেই তাকে বিসর্জন দিতে হবে, কোন বাধা নাই। শ্রীমদ্‌দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বাল্যকালে শিব পূজার পর মন্দির প্রহরা দেবার সময় তিনি দেখলেন কতকগুলি ইঁদুর শিবলিঙ্গের উপরে ঘোরাঘুরি করছে, নৈবেদ্য খাচ্ছে। কিন্তু পাথরের শিবলিঙ্গ অনড় অচল। তাতেই তাঁর মনে হল যে ঐ শিবলিঙ্গ তো ঈশ্বর নন। ঈশ্বর হলে সামান্য ইঁদুরকে তিনি তাড়াতে পারতেন। তবে এ কার পূজা হচ্ছে? এ তো পুতুল পূজা। তিনি তখন বেদান্তমতের ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করলেন। তিনি এক হিসাবে সিদ্ধ পুরুষ সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা কি সংক্রমণযোগ্য? তাঁর অনুসরণকারীরা কি সেই জ্ঞান লাভ করেছিল? প্রতিমাপূজক হিন্দুরাও যথাযথ পূজা-সাধনাদ্বারা যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তখন পূজা অর্চনার লোপ হয়।

ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরাও অনুরূপ কথাই বলেন। মহানির্বাণতন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসের শ্লোকগুলি তাঁরা তাঁদের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে উল্লেখ করেন। রাজা রামমোহন রায় সাধু সন্ত বা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। তবুও তিনি

মহানির্বাণতন্ত্রকে আশ্রয় করেই ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। সেই ।নয়কার সমাজবিপর্যয়েব এবং অবক্ষয়েব দিনে রাজা রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। তৎকালীন হিন্দুসমাজ দুই দিককাব পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে প্রায লুপ্ত হতে বসেছিল। একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাবা প্রাচীন স্মৃতিব বিধানেব বিন্দুমাত্রও ছাড়তে বাজি নয। মুসলমান আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দু মন্দিব ও হিন্দু নাবী। তাই, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাদেব হাত থেকে রক্ষাব জন্য নাবীদেব সেই সময়ে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করা হয়েছিল। তখন, আত্মবক্ষার জন্য তাই ছিল সংগত। কিন্তু মুসলমানের পর ইংবেজরা যখন এলো, তখন নারীদেব আর অন্তঃপুরে রেখে দেবার প্রয়োজন ছিল না। রাজনৈতিক পটপবির্তনেব সঙ্গে হিন্দু নারীব অন্তঃপুবেব বন্ধন হতে মুক্তির প্রযোজন এই সুযোগ হিন্দুসমাজ সেদিন গ্রহণ করেনি। বামমোহন এসে এই যুগোচিত ঐতিহাসিক কৃত্য সম্পাদন করেন। জাতিবিচাব, নারীজাতির প্রতি অনুদার ভাবধাবার পবিপ্রেক্ষিতে গোটা সমাজের কুর্মবৃত্তিব প্রচেষ্টা, অন্য দিকে সদ্য ইংরাজী শিক্ষার চোখধাঁধানো আলোয দিশাহাবা তরুণদেব ডিবোজিও স্কট প্রভৃতিব প্রভাবে হিন্দুসমাজকে অধঃপতিত অসভ্য সমাজ বিবেচনা ও খৃষ্টধর্মের আলোকে নিজেদের পথসন্ধান।

রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ এই দুই আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা মধ্যবর্তী আপোষ। কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রেব ব্রহ্মস্তোত্র বা চতুর্দশ উল্লাসে প্রদত্ত যুক্তিগুলিই তাঁব ধর্মের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু শাস্ত্র মানতে হলে তার অংশবিশেষকে মান্য করা যায় না। মহানির্বাণতন্ত্রের পূর্বাপর অধ্যায়-গুলিতে মানুষ কিভাবে পূজাবিধি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হবে তার বিধান দিয়েছেন।

ব্রাহ্মগণ মহানির্বাণতন্ত্রের এই শ্লোকগুলি গ্রহণ কবেছেন—

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১৩

বিহায় নামরূপানি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ ॥ ১১৪
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ১১৫

★ ★ ★ ★ ★

বালক্রীড়নবৎ সর্বং রূপাণামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭

★ ★ ★ ★ ★

মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদি মূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষ' ন যান্তি তে ॥ ১১৯

অর্থ : ব্রহ্ম থেকে তৃণগুল্মপর্যন্ত সমুদায় জগৎই মায়াদ্বারা পরিকল্পিত হয়েছে। একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই কথা মেনে নিত্য সুখ ভোগ করেন। ১১৩

যিনি নামরূপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারেন তিনিই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। ১১৪

জপ করলে মুক্তি হয় না, হোম করলেও মুক্তি হয় না। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মালেই মানুষ মুক্তি লাভ করে। ১১৫

ব্রহ্মের নামরূপ ইত্যাদি কল্পনা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বাল্য-ক্রীড়া ত্যাগ করতে পারেন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী। ১১৭

যারা মৃত্তিকা বা প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত বা কাষ্ঠাদিনির্মিত মূর্তিকে ঈশ্বর বোধ ক'রে তপস্যা করে তারা কেবল বৃথা কষ্ট পায়। ১১৯

এই শ্লোকগুলিতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা প্রথমাবধি ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেই আসে না। মহানির্বাণতন্ত্রও সাধকের সাধনার পরিপূর্ণ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেছেন। তার আগের অধ্যায়গুলিতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা এবং কিভাবে তার মধ্যে চৈতন্যময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অগ্রসর হতে হয় সব বিধিই আছে। বাক্যমনের অগোচর বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর বা

ব্রহ্মকে মনশ্চক্ষে দেখা একপ্রকার অসম্ভব। সর্বব্যাপিত্বের অনুভবও কষ্টকর। কোন একটি প্রত্যক্ষীভূত কেন্দ্রবিন্দুতে মনঃসংযোগ না করলে ধ্যান আসা সম্ভবপর হয় না। এবং ধ্যানের পরবর্তী আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাগুলিও পরিস্ফুট হয় না। মনকে যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাববার ভার দেওয়া হয়, সে যা হোক একটা রূপ চিন্তা ক'রেই তাতে মন অর্পণ করবে। একথা মনোবিজ্ঞানসম্মত যে মন কোনও বস্তুর উপরে আরোপ না করে বিকল্প কিছু ভাবতে পারে না। যে ব্যক্তি তাজমহল দেখে নাই বা তার ছোট মডেলও দেখে নাই তাকে তাজমহলের বিবরণ দিয়ে মনে মনে ভাবতে বললে সে যাহোক একটা ইমারত মনে মনে খাড়া করে ভাববে। এখানেই কিন্তু প্রতিমা এসে গেল।

কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।

পাথরের, কাঠের, ধাতুনির্মিত, মৃৎ-চন্দনাময়ী (লেপ্যা), পট বা ছবি (লেখ্যা), বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী (রত্ন দিয়ে তৈরী) এই আট রকমের প্রতিমা হয়। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে মনোময়ী রূপ সৃষ্টিকেও প্রতিমা বলা হয়েছে। তাহলে যারা প্রতিমা পূজার বিরোধী তারা কি ধ্যান করবে? সেই নিরাকার ঈশ্বরের চরণতলে কি করে মাথা নোয়াবেন—চরণ চিন্তা করলেই যে প্রতিমা এসে গেল। মনকে বাদ দিয়ে উপাসনা? মনোভূমির ঊর্ধ্বে যে শুদ্ধ চৈতন্যভূমি তাতে উঠে গেলে তখন উপাস্য উপাসক সব একাকার হয়। তখন উপাসনা থাকে না। কিন্তু সে তো অন্য অবস্থা। **উপাসনা যতক্ষণ আছে প্রতিমাও ততক্ষণ আছে। প্রতিমা ভিন্ন উপাসনা হতে পারে না।** কেউই রেহাই পান না—খৃষ্টানগণ ক্রুশকাঠ, ম্যাডোনামূর্তি রাখেন, মুসলমানগণ মসজিদের পশ্চিম ভাগে একটি ছোট ঘর ও বেদী এবং নূর অর্থাৎ জ্যোতিরূপে ঈশ্বরচিন্তা করেন। সবই প্রতিমা পূজারই রূপান্তর মাত্র। হিন্দুগণ অধ্যাত্মবাদের অনেক সূক্ষ্ম দর্শনে প্রবেশ করেছেন সেজন্য তাঁদের প্রতিমা পূজা উপাস্যভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তাঁরা অকপটেই স্বীকার করেন যে চৈতন্যময় সর্বব্যাপী ব্রহ্মচিন্তার পথস্বরূপ তাঁরা প্রতিমা পূজা করেন। অর্থাৎ প্রতিমার মধ্য দিয়ে তাঁরা চিন্ময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসেন। এই পূজা পুতুল পূজা নয়। শ্রীমদ্‌দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাকবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথও এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁরা অনায়াসেই একে পৌত্তলিকতা বলেছেন।

মূর্তি পূজা সম্পর্কে মহাবৈষ্ণব সাধক আচার্য্য রামানুজের একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। আচার্য্য রামানুজ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের পিতলের মূর্তি পূজা করতেন। একদিন মূর্তি পূজায় আস্থাহীন এক বেদান্তবাদী তাঁর বাড়ীতে অতিথি হলেন। আচার্য্যের পূজার সময় উপস্থিত। অতিথিকে সাদর আপ্যায়ন করে আচার্য্য পূজায় বসলেন। বিগ্রহের সামনে পূজান্তে ভোগ নিবেদন করলেন। বেদান্তবাদী বিস্মিত হয়ে রামানুজকে বললেন আপনি মহাজ্ঞানী ভক্ত সাধক। ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী। আপনি সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের পূজা করতে বসে এই সামান্য মূর্তিগুলোর পূজা করছেন কেন? রামানুজ বললেন, আমি এখন ধুনি জ্বালব। অনুগ্রহ করে পাশের বাড়ী থেকে একটু আগুন আনুন। ধুনি জ্বেলে তারপর ধুনির কাছে বসে আপনার কথার উত্তর দিই। তখন বেদান্তবাদী বললেন, এখনই আগুন নিয়ে আসছি। একটু পরে ভদ্রলোক একটা কাঠের মাথায় করে আগুন নিয়ে এলেন। রামানুজ বললেন, আমি আপনাকে আগুন আনতে বললাম, আপনি একখানা পোড়া কাঠ নিয়ে এলেন কেন। আমি আগুন চেয়েছি, আগুনই আনুন। দেখুন আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। আপনি আপনার দুটি হাত ঘসে দেখুন গরম হয়ে যাবে। অতএব আপনি শুধু আগুন নিয়ে আসুন, পোড়াকাঠ চাই না।

ভদ্রলোক তখন ইতস্ততঃ করে বললেন, আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে এ সত্য কথা, আপনার নিকট আনতে হলে একটা কিছুকে অবলম্বন করেই আনতে হবে, তাই আমি কাঠকে অবলম্বন করে আগুন এনেছি। আচার্য্য তখন কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, দেখুন সর্বব্যাপী সর্বভূতস্থ

ব্রহ্ম একথা সত্য কিন্তু আমার নিকটতম করে তাঁকে আনতে হলে মূর্তিতে তাঁকে আরোপিত না করে আর কি উপায় আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ব্রহ্ম। এঁকে আমি মনের সামনে আনি কি করে। আপনার হাতে যে কাঠখানা আছে ওটা আগে ছিল কাঠ কিন্তু আগুনের ছোঁয়ায় এখন হয়ে গেছে অগ্নি। তেমনি এই পিতলের মূর্তিগুলি এক সময়ে ছিলেন পিতলমূর্তি কিন্তু এখন উনি হয়েছেন চিন্ময় পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নারায়ণ তো যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে এসেছেন, তেমনি এখন এসেছেন অর্চাবতার রূপে।

আচার্য্যের এই বিশ্লেষণে বেদান্তবাদী বুঝতে পারলেন যে সত্য সত্যই যদি ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হয় তবে শুধু পাণ্ডিত্যমাখা বিশ্লেষণে নয়, ভক্তি আর জ্ঞান মিলিয়ে তন্ত্রের প্রবর্তিত এই বিগ্রহরূপে ভগবানের পূজার মধ্য দিয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে।

গীতার ভক্তিযোগ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাংকে যোগবিত্তমাঃ॥

অর্থ : হে ভগবান্, নিরন্তর ভগবৎকর্মাদিতে নিযুক্ত হয়ে যে সকল অনন্যশরণ ভক্ত সমাহিত চিত্তে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা সকল কর্ম ও বাসনা ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এ দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বললেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

অর্থ : যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত তাঁদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়। সগুণ ভগবানের চিন্তাযুক্ত ভগবৎ-কর্মাদিপরায়ণ মানুষের পক্ষে এই উপাসনা সহজ হয়। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর।

শাস্ত্রবাক্য অনুসারে উপাস্যবস্তুকে মনের বিষয়ীকরণদ্বারা তাঁর সমীপস্থ হয়ে তৈলধারার মত সমান প্রত্যয় প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্থিতির নাম উপাসনা। এই উপাসনায় মনের সাহায্য সর্বাধিক এবং মন সর্বদাই বিকল্পীকরণে অভ্যস্ত। অখণ্ড সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে বিকল্প ভাবধারাদ্বারা যে কোনও ইষ্ট দেবতাতে আবিষ্ট হওয়াই উপাসনার সরল পথ। সেই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন ·

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।······

"কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য যোগের দ্বারা আমার উপাসনা ও ধ্যান করে আমি তাঁদের মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে ত্রাণ করি।" কাজেই প্রতিমাকে অবলম্বন করে ইষ্টের অর্চনা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং অধ্যাত্মমার্গে আরোহণের সহজ উপায়।

গৃহচূড়ে নর যথা সোপান বহিয়া ওঠে ধীরে ধীরে
এ জগতে নিরন্তর বহি সুখদুঃখস্তর
ওঠে কি মানব আত্মা তোমার মন্দিরে।

মানবাত্মার এই উত্তরণের পথ হল উপাসনা। উপাসনা করতে হলে, নিরন্তর ইষ্টে প্রত্যয় প্রবাহে অবস্থিতি করতে হলে যে ভাবেই হোক প্রতিমার প্রয়োজন।

তন্ত্রের অবদান এই প্রতিমা এবং পূজা। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

যে শীঘ্রই হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিকে ছেদন ক'রে পরমাত্মাকে জানতে ইচ্ছা করে সে তন্ত্রের বিধানমত উপচার সহকারে কেশবকে অর্চনা করবে। গুরুর নিকট হতে আগমোক্ত পথ এবং তাঁর কৃপারূপ পাথেয় সংগ্রহ করবে।

শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে শিক্ষা দিতে বসে চৌষট্টি অঙ্গ সাধনের কথা বলেছেন। তার মধ্যে পাঁচটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপরিহার্য্য বলেছেন। এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে "শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন" অন্যতম প্রধান ভজন বলেছেন।

তন্ত্র বলেছেন গাভীর দুগ্ধ তার রক্ত থেকেই সঞ্জাত। কিন্তু গাভীর সর্বাঙ্গে যে কোনও স্থানে চাইলেই দুধ পাওয়া যাবে না। গাভীর স্তন থেকেই দুধ ক্ষরিত হয়। সেই রকম সর্বব্যাপী ব্রহ্মের অবস্থিতি সর্বত্র হলেও প্রতিমাতে ভক্তি ও নিষ্ঠাপূর্বক পূজা করলে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

এইবার আমরা আগমোক্ত বিধিগুলির মধ্যে প্রবেশ করব। কিভাবে প্রতিমাকে আমাদের চক্ষু ও মনের সম্মুখে রেখে সেই প্রতিমার ভিতর দিয়ে চৈতন্যময় পরব্রহ্মের উপলব্ধি করতে পারি তার ব্যবস্থা তন্ত্রে উক্ত হয়েছে। এই যে আরাধনা, এরই নাম পূজা। কিন্তু পূজায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সংযত তদ্‌গত এবং একাগ্র মনের। দ্বিতীয় প্রয়োজন গুরূপদিষ্ট প্রণালী-গুলির প্রতি নিষ্ঠা। তৃতীয় হল পূজোপচারগুলির শাস্ত্রনির্দেশিত যথার্থতা। প্রতিমার সামনে বসে ভক্ত উপলব্ধি করে তার অতি নিকট, মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ, মহান্ অথচ অহমিকার লেশহীন প্রাণের ঠাকুর যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের বাড়ীতে যদি এমন ধরণের কোনও মহান্ অতিথি আসেন, আমরা কি করি? আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমরা বলি, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। বসুন, বসুন, এই বলে শ্রেষ্ঠ আসনখানি তাঁকে দিই। তার পরে তাঁর পা ধোবার জল এবং আরও যা যা প্রয়োজন না চাইতেই এনে দিই।
তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি অবিকল সেই ভাবধারায় ভক্তগণের মন আপ্লুত করে। এখানে একটা উদাহরণ রেখে সবটার ব্যাখ্যা চলতে পারে।

মনে করা যাক, কেউ দক্ষিণা কালীর পূজা করতে বসেছে। দক্ষিণা কালীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তার সামনে। মৃন্ময়ী কালিকামূর্তির তাৎপর্য্য ভক্ত অনুধাবন করেছে। (প্রথম প্রবন্ধ কালীতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।) কিন্তু সাধকের

কাছে এখনও প্রতিমা মৃন্ময়ীই আছে। সাধক-ন্যাস প্রাণায়াম দ্বারা নিজের এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে চৈতন্যময়ীর আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এইবার সে প্রতিমার দিকে চেয়ে ধ্যানমন্ত্র আবৃত্তি করল। তারপর প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হল। পূর্ণ মনঃশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সাধক লেলিহা মুদ্রায় প্রতিমার বক্ষস্থলে হাত দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে অগ্রসর হল—অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।

ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হোক, বিশ্বের প্রাণসমুদ্র ক্ষরিত হোক এই প্রতিমাতে। আমিও তো এই প্রাণসমুদ্রের একটি বিন্দু, আমিও মিশে যাই এই উজ্জ্বল আনন্দে। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি চাই, তাই সাধক আগে উচ্চারণ করল আং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং-সং হৌং। আং-এর অর্থ আমার জীবত্বের অভিমান, ক্রোং পরাশক্তি। পরে অন্যান্য বীজগুলি বায়ু অগ্নি, ক্ষিতি প্রভৃতি এবং অপরাশক্তি সবই হে দেবী তোমাতে অর্পণ করলাম। হৌং মনপ্রাণ দিয়ে উচ্চারণ করলাম, সবই তোমাতে অর্পণ করলাম। এবার আমি হংসঃ শুচি শুদ্ধ—মায়ার আবরণহীন পরমাত্মায় পরিণত হলাম। এই ভাবে পাঁচবার মনঃ সংযোগ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকে আহ্বান করবে প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হবার জন্য। নিজেকে সেই সত্তায় মিশিয়ে দিয়ে শুচিশুদ্ধ অস্তিত্ব নিয়ে পূজার উপচার অর্পণ করবে।

সাধক উপলব্ধি করবে মন্ত্রের যথার্থ রূপ।

জীবত্বের মোহ মোর নিঃশেষিত হয়ে যাক
মা তোমার আনন্দ সত্তায়
ইন্দ্রিয়জ গ্লানি যত লীন হোক
বিশ্বব্যাপী চৈতন্যসত্তায়।
বাক্য মন ত্বক্ চক্ষু শ্রোত্র আর ঘ্রাণ
মোর দেহ মোর কণ্ঠ আমার এ প্রাণ
তোমার রূপের মাঝে হউক বিলীন।

মনে স্থিত পরা ও অপরা শক্তি
জ্ঞানময় শক্তি মাঝে মিশে যাক ক্রমে হয়ে লীন।

এই উপলব্ধি কি পুতুল পূজায় হয়? মহানির্বাণ তন্ত্রেই বলা হয়েছে—সদাশিব বলছেন—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ (১৩/১১)

যাদের জ্ঞান ও সাধনা সু-উচ্চ স্তরে ওঠে নাই তাদের হিতের জন্য অর্থাৎ তারা যাতে উপাসনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে পারে তার জন্যই ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হয়েছে।

এইবার উপচার নিবেদনের মধ্য দিয়ে সাধক কিভাবে সেই ব্রহ্মশক্তির সামীপ্য অর্জন করছে তাই দেখতে পাই—সাধক আসন দিচ্ছে দেবীকে, যথাযথ মন্ত্রে আসন নিবেদনের পর বলছে—

সর্বভূতান্তরস্থায় সর্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনন্তে নমো নমঃ॥

যদিও তুমি সর্বভূতেব অন্তরে অবস্থান কর, তুমিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা--তুমি অসীম—কিন্তু আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তোমার অসীমত্ব কল্পনা করতে পারি না, সেজন্য এই সসীম ক্ষুদ্র আসনেই তোমার অবস্থান কল্পনা করে তোমাকে বসতে বলছি।

ওঁ হৃৎপদ্মমাসনং মাতর্যত্র স্ফুরতি নির্মলঃ।
বোধঃ সর্বপরিব্যাপী কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

যে হৃদয় থেকে নির্মল বোধের উদ্ভব হয়ে দিক্‌দিগন্ত ছড়িয়ে পড়ে সেই নির্মল বোধের আসনে তোমাকে বসাবার জন্য আমার হৃদয়ও নির্মল করবার চেষ্টা করছি। মা কৃপা করে এখানে বস।

যাঁরা প্রতিমা পূজার নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন কত উচ্চ ভাবে চলে যাবার জন্য সাধক বসেছে ঐ প্রতিমার সামনে।

এবার জানান হচ্ছে স্বাগত ভাষণ। সর্বব্যাপী চৈতন্যময়ী শক্তি সামান্য আকার ধারণ করে সাধকের সুবিধার জন্য তার সম্মুখে এসেছেন। আনন্দে উৎফুল্ল সাধক তাই স্বাগত ভাষণ জানাচ্ছে

দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্।
সুস্বাগতং স্বাগতং মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং যত্ত্বয়া তস্মে তপসাঃ ফলমাগতম্ ॥

নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতারা পর্যন্ত যাঁর দর্শন কামনা করেন, হে পরমাত্মরূপা দেবী—আজ আমার এই পূজার স্থানে তুমি অনায়াসে এসেছ। আজ আমার জন্ম সফল, জীবন সফল হল, সব ক্রিয়া ধ্যান পূজা সবই সার্থক হল। মা আজ আমি তপস্যার ফল পেলাম।

এমনি করেই একের পর এক উপচার নিবেদন—একের পর এক ধাপে ধাপে সেই সচ্চিদানন্দের নিকটস্থ হওয়া।

পাদ্য—মহামান্য, পূজনীয়দের আহ্বান করলে পাদপ্রক্ষালনের জল দিতে হয়। সেই বিশ্বব্যাপী সত্তা ছোট প্রতিমার রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন সাধকের গৃহে। সাধক পাদ্য দিচ্ছে তাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে কাকে পাদ্য দিচ্ছি।

যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগৎত্রয়ম্।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥

যাঁর পাদস্পর্শকৃত জলের স্পর্শে ত্রিলোক শুদ্ধ হয়, তাঁর চরণকমল প্রক্ষালনার্থে আমার কল্পিত এই পাদ্য গ্রহণ কর মাতঃ।

ওঁ চরাচরমিদং সত্যং সর্বং জ্ঞানময়ং ততঃ।
এবং যৎ নির্মলং জ্ঞানং তৎ পাদ্যং কল্পয়ামি তে ॥

এই বিশ্বচরাচর সকলই সত্য জ্ঞানময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের অংশীভূত।
এই যে নির্মল জ্ঞান, মাতঃ এই তোমার পাদ্য।

অর্ঘ্যদানের মধ্যে সাধক যে ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ে তা অনির্বচনীয়। এই সময় সাধকের মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবখানি প্রাণ ও চৈতন্যের সাগরের সে যেন একটি বিন্দু। সাগরের এক বিন্দু জলও সমুদ্রের গুণবিশিষ্ট। সমগ্র সমুদ্রে মিশে থাকলে সে সমুদ্র, আলাদা হলেই সে বিন্দু। মন্ত্রের প্রথমার্ধের পর সাধক যে অংশ উচ্চারণ করেন, কি অপূর্ব সেই মন্ত্র—

ওঁ যঃ প্রাণবিন্দুর্মদীয়ো মহাপ্রাণাম্বুধৌ ত্বয়ি।
সোঽয়ং সম্মিলিতো মাতরিত্যর্ঘ্যং কল্পয়ামি তে॥

মাগো, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু মহাপ্রাণসমুদ্রস্বরূপিণী তোমার থেকে স্ফুরিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিতে পৃথক সত্তারূপে বিচরণ করতে আরম্ভ করেছিল। (তন্ত্রদর্শনে ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য)। তারপর সুখ-দুঃখের ভ্রাম্যমান চক্রে ঘুরতে ঘুরতে তার উৎপত্তিস্থল এবং শাশ্বত স্থিতি-ভূমিতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক। মা এই মিলনকামী সন্তানের প্রাণরূপ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করে তোমার মধ্যেই মিলিয়ে নাও। এই অর্ঘ্যই আজ আমার নিবেদন।

কি ভাব! এর চেয়ে উচ্চ জ্ঞান আর কি করে কল্পনা করা যায়!

আচমনীয় দিচ্ছে সাধক—যথাবিহিত মন্ত্রের শেষভাগে বলছে—

ওঁ ত্বত্তো ভিন্নঃ জগজ্জীবঃ ইতি যৎ ভেদকল্পনম্।
তৈ নৈবাচমনং কৃত্বা নির্মলং কুরু মাং শিবে॥

জগতের জীব তোমা হতে পৃথক এই ভেদকল্পনাই সাধকের পক্ষে ক্লেশকর মালিন্যের হেতু। এই মলিনতা দূর করবার জন্য অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাব সাধন। তাই এই আত্ম-অনাত্মভেদকে বিধৌত করবার জন্যই আচমনীয় রূপে আমার এই সাধনা তোমাকে দিচ্ছি। মা আমার সকল মলিনতা ধুয়ে নির্মল করে তোল।

মধুপর্ক—দধি ঘৃত মধু চিনি ও জল সহযোগে মধুপর্ক সেবন পূর্বকালে প্রথাসিদ্ধ ছিল। পরম পুষ্টিকর স্নিগ্ধ এই পানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সেবনার্থে নিবেদন করা হত। কাজেই এই উপচার নিবেদনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই মধুপর্ক নিবেদনও অবশ্য কর্তব্য হিসাবেই ধরা হয়েছে। সাধকের প্রাণের ইষ্ট তার গৃহে এসেছেন তাই সাধক নিজে যাতে যাতে তুষ্ট হয় তাই তাই তাঁকে নিবেদন করছে। যথানিয়মে মন্ত্রসহযোগে মধুপর্ক নিবেদন করে পরে সাধক প্রার্থনা করছে—

ওঁ একস্মিন্ চিদ্রসে পঞ্চরসা বিষয়সম্ভবাঃ।
পঞ্চামৃতং বিচিত্রং তৎ মধুপর্কোঽয়মুত্তমঃ॥

এক চৈতন্য থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে পঞ্চরস সংগৃহীত হয়, সবই ইন্দ্রিয়গণের বিষয় থেকে জাত। সমস্ত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, রস, সবই চিন্ময় সত্তা থেকে নিঃসৃত হয়। সেই পরম রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ থেকে সঞ্জাত এই পঞ্চ রসসম্ভারের প্রতীক রূপে এই মধুপর্ক তোমাকে নিবেদন করছি। মা তোমার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা এই মধুপর্ক গ্রহণ কর।

স্নানীয় জল—অন্যতম উপচার। কারণ সাধক নিজেও স্নান করেই পূজায় বসেছে। কিন্তু স্নানীয় জল দিচ্ছে সে। তাই আবেগ ভরে সে উচ্চারণ করল—

ওঁ যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্যৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে॥

মা তুমি জগতের আধার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধার—তোমার তেজেই বিশ্ব উৎপন্ন। সমগ্র বিশ্ব তোমার তেজেই বিধৃত। তুমি অসীম, অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু মা আমি যে নিজে সসীম এবং সংকীর্ণ আধারের চেতনাবিশিষ্ট জীব, সেই কারণেই আমি ঐ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বশবর্তী হয়ে স্নানজল অর্পণ করছি।

বস্ত্র—(বস্ত্র নিবেদনের যে রীতি আছে তাতে শাস্ত্রোক্ত বিধানে পূর্ণ বয়স্ক মানব মানবীর পরিধানের মত বস্ত্র দিতে হয়। আর সাধক বা গৃহ-কর্তা বা গৃহকর্ত্রী যেমন বস্ত্র প্রীতমনে পরিধান করতে পারেন, সেই রকম বস্ত্র দিতে হয়। কারণ যাঁকে নিবেদন করা হচ্ছে তিনি চৈতন্যময়ী বিশ্বব্যাপী শক্তি। নিবেদনের সসীম জ্ঞানই এই বস্ত্র নিবেদনের উপলক্ষ্য। কাজেই শাস্ত্রোক্ত বিধান অবশ্যই পালনীয়।)

সাধক এইবার বস্ত্র নিবেদন করছে—

ওঁ সর্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে॥

মা, ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী তুমি, তোমার কোনও আবরণ নাই। তোমাকে কোনও আবরণের দ্বারা আবৃত করা যায় না। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী নিজমায়াদ্বারা সমগ্র তেজ আমার চোখ ও মনের সম্মুখ থেকে আবৃত করে

রেখেছে। আমি সামান্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানযুক্ত মানুষ তাই ঐ মায়ার আবরণে আবৃত তোমার এই প্রতিমার জন্য এই বস্ত্রের কল্পনা করছি। তোমায় নমস্কার করি। আমার অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

আভরণ—(আভরণ নিবেদন করার সময়ও বস্ত্রের মত বিধিসম্মত আভরণ দিতে হবে। কোন রকম দায়সারা জিনিস দিলে পূজার অঙ্গহানি হয়।)

যথাযথ মন্ত্রের পর প্রার্থনা করবে সাধক—

ওঁ বিশ্বাভরণভূতায়ৈ বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে ॥

যিনি এই বিশ্বের আভরণ স্বরূপ, যাঁর শোভায় বিশ্ব শোভিত, এই মায়াময় প্রতিমাকে তাঁরই প্রতিচ্ছবি কল্পনা করে এই মায়াময় আভরণ আমি নিবেদন কর্ছি। মা এই ক্ষুদ্র আভরণ গ্রহণ কর।

লৌকিক নিয়মে শাঁখা সিন্দুর—আরও অনেক কিছুই সাধকের ইচ্ছামত নিবেদন করতে পারে সাধক। কিন্তু সব সময়েই সে প্রতিমার মধ্য দিয়ে সচ্চিদানন্দকে দেখতে পাচ্ছে।

অতঃপর গন্ধ নিবেদন। গন্ধ বলতে চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর সব মিলিয়ে অথবা শুধু চন্দনকেই গন্ধ হিসাবে দেওয়া হয়।

যথাযথ মন্ত্রের পর প্রার্থনা

ওঁ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা
তস্মৈ পরমাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে।

যিনি গন্ধগুণ বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম বীজদ্বারা (গন্ধতন্মাত্র) গন্ধের আধারস্বরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেই পরমাত্মস্বরূপাকে এই উৎকৃষ্ট গন্ধ অর্পণ করছি।

ওঁ শান্তিঃ ক্ষান্তিঃ সুশীলতা সরলতা নির্মৎসরত্বাদয়ঃ।
অঙ্গালেপনচারুচন্দনমিদং দেব্যা প্রদেয়ং প্রিয়ম্ ॥

মাতঃ যত গন্ধই তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি না কেন, তুমি সবচেয়ে তৃপ্ত হও সাধকের মানসিক প্রসন্নতা ক্ষমা সচ্চরিত্রতা সরলতা দ্বেষরহিতভাব

এই সব সদ্‌গুণ থাকলে। মা তাই প্রার্থনা করি আমাতে এই সব গুণ আরোপিত হোক। আমার এই গুণগুলিকেই তোমার অঙ্গবিলেপন করে নিবেদন করি।

এর পরে পুষ্প, পুষ্পমাল্য, সচন্দন বিল্বপত্র, ধূপ দীপ নিবেদন করবে ভক্ত।

পুষ্প নিবেদনেও সেই আত্মশুদ্ধি এবং আত্মনিবেদনের আকুলতা।

পুষ্প নিবেদনের মন্ত্র আলোচনা করা যাক—

পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবসেবিতম্।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥

মনোহররূপ, সুগন্ধ, মনোজ্ঞতা এবং অপরূপত্ব এই সব দেবলোকের গুণযুক্ত দৈবী সম্পদ্ বহনকারী এই পুষ্পকেই তাই আত্মনিবেদনের প্রতীক হিসাবে মা, তোমার চরণতলে সমর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ কর।

এর পরে প্রার্থনা—

ওঁ ভক্তিঃ প্রেমরসঃ প্রসাদপরমানন্দয়ো যে গুণাঃ
তৈঃ সর্বৈর্নিজভাবশুদ্ধকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ পরৈঃ সুন্দরৈঃ।
সম্পূজ্যা পরমেশ্বরি নিজগুণৈর্ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

ভক্তি প্রেম চিত্তের প্রসন্নতা পরমানন্দ প্রভৃতি হৃদয়স্থিত পুষ্পের প্রতি নিজের বিশুদ্ধিদ্বারা শুদ্ধ কুসুমাঞ্জলিদ্বারা তোমাকে পূজা করবার আগ্রহে লিপ্ত হয়েছি। মা তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের ভার গ্রহণ কর।

ধূপ—যথাযথ মন্ত্রসহযোগে ধূপ নিবেদন করে তারপর সাধকের প্রর্থনা –

ওঁ কর্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে।
দেব্যাঃ মাতুর্দশাঙ্গদাহসুরভির্ধূপঃ সদা বল্লভঃ॥

মা পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত যাবতীয় উপচার বৈরাগ্যের আগুনে নিক্ষেপ করে তার সুরভি দিয়ে আরতি করবার মত শক্তি প্রদান কর। কারণ এই ধূপের সুরভি তোমার প্রিয়।

দীপ নিবেদন—যথাযথ মন্ত্রের পর—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতিঃ দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

মহাদীপ্তিশালী এই দীপ সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে। আমার অন্তরের বাহির এবং অভ্যন্তরের সকল অন্ধকার এই দীপের আলোকে আলোকিত হোক। মাতঃ এই দীপ গ্রহণ করে আমার অন্তরে প্রেরণ কর।

যস্মিন্নুজ্জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমো
বাহ্যং ন চাভ্যন্তরং।
সোঽয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো
দীপঃ সমুজ্জ্বাল্যতাম্॥

মা, যে জ্ঞানদীপ জ্বলে উঠলে অনাত্মদর্শনজনিত অন্ধকার বাহিরের আচার ব্যবহার এবং অন্তরের মানসিকতা থেকে দূরীভূত হয়ে যায়, তোমার চৈতন্যময়ী সত্তার সঙ্গে এক অখণ্ড সেতুবন্ধনে জীব বদ্ধ হয়ে যায়, সেই জ্ঞানময়, সর্বসত্য প্রকাশক দীপ প্রজ্বালিত কর, আমি জ্ঞানময় দিব্যচক্ষু লাভ করি।

নৈবেদ্য নিবেদন—

এই প্রসঙ্গে সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের একটা গানকে অবলম্বন করে প্রতিমা পূজার বিরোধী ব্রাহ্মগণ কিছু কিছু কথা বলেছেন।

রামপ্রসাদের গানের শেষ ভাগে আছে—

ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
তুমি সেই মাকে সাজাতে চাওরে দিয়ে ছাড় ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা
তুমি কোন লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয় আলোচলে আর বুটভিজা না
মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

সাধক রামপ্রসাদ সাধনতত্ত্বের অনেক কয়েকটি স্তর পার হয়ে চূড়ান্ত স্তরে প্রবিষ্ট হবার ব্যাকুলতায় মনের এই ভ্রম অপনোদনের কথা বলেছেন। কিন্তু এই সব স্তর অতিক্রম করতে তাঁকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হতে হয়েছে। অথচ এই স্তরভেদের বিষয় উপলব্ধি না করে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় গান রচনা করেছেন—

মন একি ভ্রান্তি তোমার
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে ইহাগচ্ছ বল তাকে
তুমি বা কে আন কাকে একি চমৎকার
অনন্ত জগদাধারে আসন প্রদান করে
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে একি অবিচার।
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাঁহার।

সাধক প্রতিমা পূজা করতে বসে কাকে ডাকেন, কেন ডাকেন তার উত্তর এই পূজা বিধির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। জগৎকে তিনি যত ইচ্ছা খাওয়ান সাজান, আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি? আমাকে তিনি যা খাওয়াচ্ছেন, আমাকে যা ভোগ করতে দিয়েছেন আমি তাঁর কাছে তাই অর্পণ করতে বাধ্য। জগৎ জোড়া কর্মকাণ্ডে আমার সমগ্র অংশ নেওয়া অসম্ভব— আমার টুকুই আমি করতে পারি। আমি যতদিন জীব আছি ততদিন দিন তিনি ভূমা। আমি যতদিন সন্তান আছি তিনি ততদিন মা। আমি যতদিন মানব আছি তিনি ততদিন ঈশ্বর। আমি যতদিন আছি ততদিন তাঁর উপাসনা। আমার আমিত্ব যেদিন শেষ হবে, তাঁর উপাসনাও আমার শেষ। অথবা উলটে বলা যায় তাঁর উপাসনার আর প্রয়োজন আমার যেদিন হবে না, সেদিন আমার আমিত্বও ঘুচে যাবে। আমাকে যতদিন আলো চাল আর ছোলা ভিজানা খেতে হবে, আমি তাঁকে না দিয়ে খাই কি করে। আমাকে যখন বসতে হয় শুতে হয়, তাঁকেই বা বসতে শুতে আবাহন না করি কি করে। রামমোহন বলেছেন—

একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাঁহার।

এই জগৎই যখন তাঁর, সাধকের ধ্যান জ্ঞান পূজা সকল ফলই তো তাঁর। যেহেতু আমার পৃথক অস্তিত্ব আমার কাছে লুপ্ত হয় নাই, সেহেতু তাঁর জিনিষই আমি যদি হৃদয়ের আবেগে তাঁকে অর্পণ করি তাহলে ভ্রান্তি

কি করে হয়। প্রতিমা পূজার বিরোধীরা আমার সংসার আমার পুত্রকন্যা আমার স্ত্রী এসব তো অনায়াসে বলেন। তাঁরা যদি নিজের ভোগের সময় তাঁরই দেওয়া বস্তু নিয়ে আহ্লাদে ভোগ করেন, আমরা তাঁরই দেওয়া আভরণ বস্ত্র নৈবেদ্য আমার মনের মত করে তাঁকে অর্পণ করি, তাতে ভ্রান্তি কোথায়। আবাহন বা বিসর্জন কেন করা হয় সম্পূর্ণ আলোচনায় তা অবশ্যই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় দুরকমের—এক হ'ল আমান্ন অর্থাৎ যা রান্না করা হয় নি। চলতি কথায় ফল, "আলোচাল আর "বুটভিজানা" বাতাসা ইত্যাদিকেই নৈবেদ্য বলা হয়। আর রান্না করা বস্তু নিবেদন করাকে বলা হয় ভোগ দেওয়া।

দুই উপচারেই সাধক মন একাগ্র ক'রে ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে চিন্তা করবে--প্রতিমায় অবস্থিতা সেই চৈতন্যরূপিনীর দৃষ্টি পড়ছে ঐ নৈবেদ্যের উপর। যথাযথ মন্ত্র বলার পর প্রার্থনা করবে

ওঁ যদ্‌ভক্ষ্যং প্রিয়মস্যা যস্য
পরমা প্রীতির্ভবেদ্ ভক্ষণে।
দ্বৈতং তত্তু নিয়মিতং নৈবেদ্যমত্যুত্তমম্।

সাধকের মনে অবস্থিত মায়ের সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় জ্ঞান যা ছিল—আমার সংসার আমার পুত্র কলত্র, সুখ-দুঃখ বোধ সব সংগ্রহ করে মা তোমার প্রীতির জন্য উৎকৃষ্ট নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করলাম। জানি যে এই নৈবেদ্যই তোমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। মাতৃসত্তা ব্যতীত জগতে আর কি আছে এই বোধ তোমাকে নিবেদন করলাম। মা গ্রহণ কর—আমার এই আত্মসমর্পণ হোক তোমার উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য।

পূজার সমস্ত নিয়মাবলী পালন ক'রে পূজা সমাপ্ত ক'রে সাধক যখন আত্মসমর্পণ করে বলে "ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং শ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকাচরণপঙ্কজে সমর্পয়ামি নমঃ। ওঁ তৎসৎ।

এই কার্যের আগে অবধি আমার এই দেহাশ্রিত প্রাণ এবং প্রাণের আশ্রয় এই দেহের দৈহিক ধর্মানুরোধে জাগরণে নিদ্রায় তন্দ্রায় স্বপ্নাবস্থায় এবং সকল অবস্থায় আমার বাক্য মন কর্মদ্বারা এবং হাত-পা উদর জননেন্দ্রিয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা যা করেছি, যা বলেছি, যা চিন্তা করেছি সমস্ত কিছু ব্রহ্মে অর্পিত হল। ব্রহ্মাগ্নিতে সব কিছু নিঃশেষিত হয়ে যাক। আমাকে এবং আমার সকল কর্মফলকে পরমব্রহ্মরূপিনী চৈতন্যময়ী মাতা দক্ষিণা-কালিকার চরণপদ্মে সমর্পণ করলাম। আমার বলতে আর আমার কিছুই থাকল না।

পূজাবিধির এই আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর প্রতিমাপূজকগণ পুতুল পূজা করে, তারা পৌত্তলিক এই কথা বলা বাতুলতা।

তবে একথা সত্য, বর্তমান যুগে সর্বজনীন পূজার নামে ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনের প্রভাবে যে সমস্ত তথাকথিত পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠান হয় তার সবকটিই পুতুল পূজা বলা যায়। বহু আড়ম্বরপূর্ণ মণ্ডপ ও মঞ্চ সজ্জা এবং দেবী বা দেবতার প্রতিমার নামে বিচিত্র ভঙ্গিমায় পুতুল নির্মাণ ও প্রদর্শন সত্য সত্যই পৌত্তলিকতা। তবে এগুলি তো পূজা নয়। আসুর-ভাবাধিকারীদের অহমিকা চরিতার্থ করবার প্রদর্শনী মাত্র। কারণ ঐ পুতুলের কাছে চাইবার মত তাদের কিছুই নাই। যা আছে তা ঐ পুতুলকে উপলক্ষ্য করে তমোগুণকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা। কিন্তু এই বিকৃতির পাশাপাশি রয়েছে দীর্ঘ দিনের সাধনার পরম্পরা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের ঐতিহ্য। জাল মুদ্রা আছে বলে আসল মুদ্রাকে যেমন প্রত্যাখ্যান করা চলে না, তেমনই তামসী উৎসবের জন্য সাত্ত্বিকী পূজাকে পরিহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় পূজনীয়ের পূজার ব্যতিক্রমে শ্রেয়ঃ বিঘ্নিত হয়—

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজা ব্যতিক্রমঃ"

ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও বস্তুবাদী জ্ঞানের (Materialism) প্রসারের ঢেউয়ে মানুষের মন অধ্যাত্ম জ্ঞান থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবার প্রবণতায় আচ্ছন্ন। জড় বিজ্ঞান সমর্থিত জ্ঞানকেই সাধারণ ভাবে সবাই বিজ্ঞান আখ্যা দেয়। কার্যতঃ এই সরলীকৃত সংজ্ঞা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। জ্ঞান সমস্ত জীব জগতের জন্মগত প্রাপ্তি। যেহেতু মানুষও জীব জগতের অন্তর্ভূক্ত সেই কারণে মানুষের জ্ঞান জন্মগত প্রাপ্তি বলে স্বীকার করতেই হবে। এই বিষয়ে ভারতীয় ধারণা মেধস মুনির কথার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

মেধস মুনি সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলছেন—

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম
যতো হি জ্ঞানিনো সর্বে পশু পক্ষি মৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যওথোভয়ঃ

মানুষগণ জ্ঞানী একথা সত্য—কিন্তু জ্ঞান তাদেরই একান্তভাবে অধিকৃত নয়। যেহেতু পশুপক্ষী-মৃগ সবারই জ্ঞান বিদ্যমান। মৃগপক্ষী প্রভৃতিরও কতক কতক বিষয়ে জ্ঞান প্রিয়তা দেখা যায় - যেমন মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান প্রিয়তা দেখা যায়। আবার অজ্ঞান অংশেও উভয়েই নানা বিষয়ে সমান। এই যে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার তুল্যতা এ সবই স্থূল ইন্দ্রিয় বোধের ব্যাপার মাত্র। পশুপক্ষীর ইন্দ্রিয় সকল অপরিণত এবং সামঞ্জস্যহীন। সেই হেতু মানুষের পরিণত মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিফলনের হিসাবে তাদের জ্ঞানকেও অজ্ঞানতা বলে মনে হয়। মানুষের

করণ বর্গ অনেক উন্নত তাই তাদের জ্ঞানও সুসংস্কৃত বলে মনে হয়। কার্য্যতঃ আহার নিদ্রা ভয় এবং বংশবৃদ্ধি এই জ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। জ্ঞান পরিমার্জিত হয়ে উঠলে—এবং পরিশীলিত হলে বিশেষত্ব অর্জন করে—তখন এই জ্ঞান বিজ্ঞান সংজ্ঞার উপযুক্ত হয়। জ্ঞানের এই বিশেষ অবস্থা অধিকাংশ মানুষই অর্জন করে না, সেজন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষেরই কোনও ধারণা নাই। অনেক অনধিকারীর কাছে শুনে শুনে তাদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তা অংশ বিশেষ মাত্র। পদার্থ বিজ্ঞান (Physics), রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry), আয়ুর্বিজ্ঞান (Ssytem of Medicine), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Cosmology), সমাজ বিজ্ঞান (Sociology) সবই আলাদা আলাদা বিজ্ঞান এবং একে অন্যের পরিপূবক। কোনটাই সব কিছুর সমষ্টি হতে পারে না। এই তালিকায অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের স্থানও অবশ্যই আছে। শক্তির যে বিস্ফুবণ যাব প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে তা জড়ধর্মী না চৈতন্য ধর্মী এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা অবশ্যই আছে ও থাকবে।

এই বিজ্ঞান আরও সুসংস্কৃত ও পরিশীলনেব উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছালে তখন প্রজ্ঞান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞান স্তরেও সব বিজ্ঞানী পৌঁছাতে পাবেন না। আইনষ্টাইন আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমুখ অনেক কয়েকজন মনীষী এই প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছেছিলেন। বিজ্ঞানেব সমস্ত শাখাতেই এবং সাহিত্য দর্শন-কাব্য-সঙ্গীত সব স্তরেই কিছু সংখ্যক মনীষী প্রজ্ঞানে উপনীত হন। তেমনই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেও প্রজ্ঞাবান মনীষী ছিলেন ও আছেন। কাজেই ভাসা ভাসা ভাবে আজকাল বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম বর্জনীয় না বুঝে এই কথা সমাজের ক্ষতিই করে, এ উক্তি বোধহীনতার লক্ষণ।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুলতঃ সমাজ বিজ্ঞানের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সূত্র অনুযায়ী এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই বাবস্থাও সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্বদেশ গ্রাহ্য হয় নাই। সেই জন্য নানা দেশে নানা ভাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মত অনুযায়ী

সূত্রগুলিকে দেশ কালোপযোগী ছাঁচে ঢেলে নিতে হয়েছে। কাজেই এই সমাজতন্ত্রবাদ সর্বদেশের সর্ব সমস্যা নিরাকরণের উপায় হিসাবে ধরা যায় না। তবে একটা কথা সত্য যে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী এবং চিৎশক্তির প্রভাব অস্বীকার করে নাস্তিক্য হেতু অনেক কয়েকটী মানবিক নীতিবোধ এই সমাজতন্ত্রবাদে স্বীকৃত হয় নাই। তার ফলে অনেক জায়গাতেই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, হিংসা, মানবিক শাশ্বত সত্যবোধ থেকে সরে আসবার প্রবণতা দেখা যায় সমাজ বন্ধনে প্রেম ও প্রীতির চেয়ে কৌশলগত প্রতিষ্ঠা লাভ অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়। এই সমস্ত দোষের কুফল বিংশ শতাব্দীতে অনেক দেশেই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে এবং এখনও তার বিরাম নাই।

এই পটভূমিকায় ভারতীয় সমাজ দর্শনে যে অধ্যাত্মবাদী সমাজতন্ত্র স্বীকৃত হয়েছিল তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত মানুষই ভারতীয় চিন্তাকে বা ধ্যান ধারণার প্রয়োগকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের প্রয়োগ বলে মনে করে থাকেন। সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শন সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাঁরা এই অভিযোগ করেন না—অজ্ঞতাই এই অভিযোগের ভিত্তি। বস্তুবাদের সূত্র অনুযায়ী বিশ্লেষিত সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ তাঁরা দেখেছেন। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আত্মিক আস্তিক্য বুদ্ধি প্রসূত সমাজতন্ত্রবাদের দাবী তাঁরা সরাসরি খারিজ করবেন কোন অভিযোগে।

পৃথিবীতে সর্বদেশে সর্ব কালে বহু দার্শনিক ও মনীষী জন্মেছেন। তাঁদের মত দিয়ে সভ্যতার উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। তিল তিল করে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতার সোপান শ্রেণী। এক অভিজ্ঞতার লভ্যাংশ আহরণ করে অপর শাখায় সঞ্চারিত করা হয়েছে তাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান তাই ভারতের সমস্ত মনীষীগণের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে প্রবর্তিত করবার চেষ্টা করেছিল — ভারতীয় অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্রবাদ।

এই বার আলোচনা করা যাক—এই মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রক্রিয়াগুলির।

ভারতবর্ষের সভ্যতার আদিকাল থেকে "বহুজন হিতায়" কথাটি প্রচলিত। বহুজন বলতে দেশের অধিকাংশ নাগরিক এই অর্থই বোধগম্য হয়।

যে ব্যবস্থা বহুজনের অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর মানুষের হিতার্থে নিয়োজিত হয় না তা কাম্য হতে পারে না। বহুজনের অভিজ্ঞতালব্ধ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। বহু কাল ধরে বহু মানুষ যে সব আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম পালন করে আসছেন তার ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি বারবার দৃষ্টি পথে আসাতে সংশোধিত হবার সুযোগ ঘটেছে।

বকরূপী ধর্ম ধর্মাত্মা ও নীতিবিদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কঃ পন্থা—পথ কি

যুধিষ্ঠির উত্তর করেছিলেন—মহাজন যেন গতঃ স পন্থা। এখানে মহাজন বলতে যুধিষ্ঠির দুইটি স্তর বিন্যাসের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন। এক—মহাজন অর্থাৎ জনগণের মহৎ অর্থাৎ বৃহৎ অংশ দুই জনগণের মধ্যে যারা মহৎ অর্থাৎ পূজ্য। তাহলে তাঁর উত্তরের বিশদ অর্থ হল জনগণের বৃহত্তম অংশ যে পথে গমন করেছেন তাই পথ এবং মহৎ ব্যক্তিগণ যে পথে গমন করেছেন সেটাই পথ।

একটা জন মানব রহিত অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ সৃষ্টি হয় কিভাবে। মানুষজনের চলাফেরার দ্বারা। বহুজন চলতে চলতে ঘাসে ঢাকা মাটীর বুকে দাগ পড়ে। পরে অন্যরাও সেই অস্পষ্ট পথ অনুসরণ করে। ক্রমে পথ চিহ্ন স্পষ্টতর হয়। বাধাদানকারী ছোট ছোট জঙ্গল অপসারিত হয়। অবশ্য এই পথ হয় আঁকা বাঁকা ঘুর পথ। তারপর কিছু বুদ্ধিমান মানুষ ঐ আঁকা বাঁকা পথকে সহজগম্য এবং সরল করে তোলবার ব্যবস্থা করেন—তাঁরাই হলেন মহৎজন। এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বহুজনের হিতের জন্য বহুজন উদ্ভাবিত পথই চলার পথ বলে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানে স্বীকৃত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে এই পথ নির্ধারণে, নির্দেশে এবং সরলী করণে শাস্ত্র সম্মত সদাচার অবশ্যই থাকবে। সদাচার বিবর্জিত নির্দেশ আপাতদৃষ্টে মনোহর হলেও তা তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। এই

সদাচার যা শাশ্বত মানবিক নীতি দ্বারা গ্রথিত তাই হল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রাণ প্রবাহ।

অন্য দেশগুলিতে মননশীল-মহৎজনদের মতে মানুষের কতক কতক দাবী আছে। যা মানুষের জন্মগত অধিকার (Birth right) বলে তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন।

এই দাবীর বিপক্ষে একটা প্রশ্নই এসে দাঁড়ায়-- তা হল অধিকারের। এই দাবী যদি প্রতিটী মানুষের সামনেই থাকে তবে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসবে স্বভাবতঃই সংঘাত। সব মানুষই এক মতাবলম্বী নয় বা একই রকম সামর্থের অধিকারী নয়। যাদের দৃঢ়তা আছে সামর্থ্য আছে তারা তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করবে সংঘাতের পথে। যারা অপেক্ষাকৃত সামর্থহীন তারা তাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। তাহলে অধিকাংশ সচেতন মানুষ অধ্যুষিত সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান কি করে হবে। ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীগণ তাই অন্য পথ অবলম্বন করলেন—আত্ম বিশ্লেষণের পথ, আত্ম শুদ্ধির পথ, আত্ম উৎসর্গের পথ, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থ সংকোচনের পথ।

তাঁরা বললেন—সমাজে প্রতিটী মানুষই জন্ম গ্রহণ করে কতকগুলি সামাজিক ঋণ নিয়ে। সেই সব ঋণের ফলেই তার ব্যক্তিজীবন বর্দ্ধিত হয় পুষ্ট হয় এবং সমৃদ্ধ হয়। মানুষ যদি কারও কাছে ঋণ গ্রহণ করে তবে উত্তমর্ণের সেই ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য। তেমনই সকল মানুষের পক্ষেই এই সামাজিক ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা উচিৎ তার সমগ্র জীবন ব্যাপী কর্মের মধ্যে। এই ভাবে গোটা মানব সমাজের প্রতিটী অংশই যদি ঋণ পরিশোধ করে চলে তবে মানুষের সমাজের প্রতিটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গই হয়ে ওঠে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তখন সমাজ একটী বৃহৎ মানবের আকার ধারণ করে। এই চিন্তাই ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদে পরিস্ফুট।

কি সেই ঋণগুলি যা নিয়ে প্রতিটী মানুষ জন্ম গ্রহণ করে আর সমগ্র জীবন ব্যাপী কর্মের মধ্যে তা পরিশোধ করে।

ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান বলে এই ঋণগুলি হল —(১) দেবঋণ (২) ঋষিঋণ (৩) পিতৃঋণ (৪) মনুজ ঋণ বা নৃঋণ (৫) ভূত ঋণ।

এই পঞ্চ ঋণ পরিশোধ প্রতিটি মানুষকেই করতে হবে সারা জীবন ধরে। জীবন ব্যাপী কর্মযজ্ঞ এই ধারাতেই চালিত হবে।

পঞ্চ যজ্ঞ—যথা (১) দেব যজ্ঞ (২) ঋষি যজ্ঞ (৩) পিতৃ যজ্ঞ (৪) মনুজ যজ্ঞ (৫) ভূত যজ্ঞ।

যজ্ঞ অর্থে আগুন জ্বেলে তাতে হবি আহুতি দিয়ে হোম কর্ম নয়। অবশ্য হোম করা দেবযজ্ঞের একটা অন্যতম অনুষ্ঠান। কিন্তু মানুষের কর্তব্য কর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে অবিচল চিত্তে সম্পাদন করাকে যজ্ঞ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলের আকাঙ্খা না করেও কর্তব্য সম্পাদন মানুষের জীবনের এক দৃঢ় পদ যাত্রা। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম মানুষের এই দৈনন্দিন যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু - বিষ্ণু স্থিতি বা পালনের অধীশ্বর। এই বাক্যে এই কথাই বলা হয়েছে—সমগ্র সমাজের এবং জীবের স্থিতি এবং পালন এই যজ্ঞের মধ্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

দেবযজ্ঞ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে মানুষের দৈনন্দিন যজ্ঞকে দেবযজ্ঞ বলা হয়। দেবতা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ প্রচলিত। দেবতাগণ কিন্তু ঈশ্বর নন। আদি আর্য সমাজে একটী জাতি ছিল—যারা উচ্চ মানবিক গুণ সম্পন্ন ছিলেন সেজন্য তাঁরা সাধারণ মানব সমাজের শ্রদ্ধা পেতেন। সমাজ কল্যাণ ও মানুষকে কল্যাণের পথে চালনা করতেন তাঁরা। তাঁদেরই বলা হত দেবতা। তাঁদের গুণগুলিকে বলা হত দৈবী গুণ।

সেগুলি হল—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতি শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম অভিজাতস্য ভারত।

গীতা ১৬। ২। ৩ শ্লোক

অহিংসা সত্য আচরণ অক্রোধ, ত্যাগ শান্তি পরদোষ প্রকাশ না করা দয়া লোভহীনতা, মৃদুতা অসৎ চিন্তা ও কর্মে লজ্জা বোধ, তেজ ক্ষমা বাহিরে ও অভ্যন্তরে শুচিতা এই সব গুণ দ্বারা তারা ভূষিত ছিলেন। উত্তর কালে মানুষ প্রকৃতির যে যে সত্তার মধ্যে দৈবী গুণ দেখত তাকেই দেবতার আসন দিত। এই ভাবে সূর্য্য চন্দ্র পবন বরুণ পৃথিবী সবই ঈশ্বরের বিভূতির বহিঃ প্রকাশের ক্ষেত্র এবং মানব সমাজের প্রতি দেবতার দয়া বলে গণ্য করা হত। সেজন্য এই দেবতাকে নিত্য কর্মের মধ্যে তাঁদের দয়ার ঋণ শোধ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এই দেবযজ্ঞের মধ্যেও মানুষের নাগরিক চেতনা বৃদ্ধির একটী অন্তরালবর্তী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সূর্য্য আলোক ও তাপ দান করেন। সূর্য্যের আলোকেই জীবনের উদ্ভব জীবনের স্থিতি। সেজন্য সূর্য্যের আলোকে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাঁর গুণগান করতে হবে। যেহেতু তাঁরা বস্তুবাদী নন সূর্য্যকে তাঁরা জড়পিণ্ড রূপে দেখেন নাই। চৈতন্য শক্তিময় ঈশ্বরের একটা বিভূতি বলে মনে করতেন। সেজন্য তাঁরা মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রে তাঁরা সূর্য্যের করুণা ধারায় স্নাত বিশ্ব মানবের কথাই বলতেন। মন্ত্রের অর্থ - স্থাবর জঙ্গমের প্রাণ স্বরূপ সূর্য্যদেব উদিত হয়েছেন আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই। আমরা স্থাবর জঙ্গমে অধিষ্ঠিত আত্মাগণ যেন সমান ভাবে তোমার কিরণ ও তাপ সেবন করতে পারি। তোমার কিরণকে যেন আমরা ধূলি ধুম এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন না করি।

পবন বায়ুর অধিপতি দেবতা। বায়ুকে দূষিত করা অপরাধ। কারণ বায়ু দূষিত হলে জনপদ ধ্বংস হয়। অসাত্ম্য গন্ধ যে গন্ধ মানুষের অপ্রীতিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকর তেমন কোনও উপকরণ জনপদের ভিতর সৃষ্টি করবে না। অসাত্ম্য বাষ্প, সিকতা, পাংশু (ভস্ম) ও ধূম দ্বারা বায়ুকে দূষিত করবে না কারণ

বাতা জ্জলং, জলাদ্দেশং, দেশাৎ কালং স্বভাবত।
বিদ্যাদ্ দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ।

চরক সংহিতা জনপদোদ্ধ্বংসনীয় অধ্যায়।

বায়ু দূষিত হলে জল দূষিত হয়, জল দূষিত হলে দেশ অর্থাৎ ভূমি দূষিত হয় এবং জনপদ ধ্বংসের বড় কারণ হিসাবে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন।

বর্তমান জগতে আবহ বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীময় বায়ু দূষণ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছেন এবং নানাভাবে এই দূষণ নিবারণের উপায় চিন্তা করছেন। ভারতীয় সমাজ চেতনায় এই দূষণকে প্রতিহত করবার জন্য দেবযজ্ঞের বিধির মধ্য দিয়ে নাগরিকগণকে সচেতন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

জলের অধিপতি বরুণ দেবতা। জল প্রাণযুক্ত স্থাবর জঙ্গমের কাছে অপরিহার্য্য। এই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ যে বিধি উল্লিখিত হয়েছে তার উল্লেখ করছি।

জলে মল মূত্র ত্যাগ পাপকর্ম, মৃত দেহাদি নিক্ষেপ, জলাশয়ের তীরে নানা প্রকার তৃণ উলুপ প্রভৃতি এবং বিষাক্ত লতাপাতা ইত্যাদি উৎপন্ন না হয় সেদিকে সকলেই প্রখর দৃষ্টি রাখবে। এর ফলে—

উদকন্তু খলু অত্যার্থ বিকৃত গন্ধ বর্ণ রূপ রস স্পর্শ বৎ
ক্লেদ বহুল অপক্রান্ত জলচর বিহঙ্গ।

জলের গন্ধ বিকৃত হয় বর্ণ বিকৃত হয় রস নষ্ট হয় স্পর্শ অন্যরূপ হয় এবং জলচর পক্ষী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। (চরক সংহিতা)

মনু সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—জলের অধিপতি বরুণ দেবতা। নিম্নলিখিত কর্মের দ্বারা তাঁকে প্রতিহত করা হয়। জলে মল মূত্র পুরীষ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করাতে। বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত বস্ত্র প্রক্ষালনে রক্ত বা বিষ নিক্ষেপে। এর ফলে প্রজাগণের ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ হয়। দেবযজ্ঞের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে নাগরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবারই সুন্দর অনুশাসন।

এছাড়াও দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের মনে দৈবী ভাবসমূহের জাগরণ হবে এই আশাতেই এই সকল নৈতিক অনুশাসন। বাল্যকাল থেকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন মন নিয়ে এই সকল নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ যথার্থ সুনাগরিক হয়ে ওঠে।

ঋষিযজ্ঞ - মানুষের সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠে নাই। এক এক মহাজন তার অভিজ্ঞতার ফলাফল জানিয়ে গেছেন, লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই অভিজ্ঞতার উপরে নূতন পর্য্যবেক্ষণ সংযোজিত হয়েছে। সভ্যতার স্বর্গের সিঁড়ি আবহমান কাল ধরে একের পর এক গড়ে উঠেছে। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু তত্ত্বের বীজ রোপিত হয়েছিল এখন তার কত পরিণত রূপ বিশ্ববাসী দেখছে। ধন্বন্তরী শিষ্য সুশ্রুতের প্রবর্তিত অস্ত্র চিকিৎসা উন্নত হতে হতে আজ অসাধ্য সাধন করছে পৃথিবীর ইতিহাসে লৌহ ভস্ম করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চূর্ণাকারে রক্ত শূন্য রোগীকে সেবন করিয়ে মহর্ষি নাগার্জুন ধাতু প্রয়োগের চিকিৎসায় অসাধারণ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর কত জটীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে রসায়ন বিজ্ঞান। দর্শন সমাজ বিদ্যা রসায়ন শাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা সবই একই ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তাই এই প্রবর্তকগণকে হিন্দুরা বলেছেন ঋষি। মানব কল্যাণে উৎসর্গীকৃত এই মহাত্মাগণের কাছে মানব সমাজ তাই ঋণী। তাঁদের সেই ঋণ শোধ করতে প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ সাধ্যমত রুচিমত নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ, গ্রন্থাদি পাঠ এবং আলোচনা করবে। এতে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারও বর্দ্ধিত হবে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও ভারতীয় সমাজ জীবনে এই ধারা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষও কর্ম ক্লান্ত দিনের শেষে একত্র হয়ে রামায়ণ মহাভারত মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ এবং আলোচনা করত। এর ফলে নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধেও জ্ঞান যেমন বাড়ত ঋষিদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নিজেদের চেতনা বাড়ত। একেই বলা হয় ঋষিযজ্ঞ।

এর প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই কোনও দিন হবেও না। যাঁদের নিকট পরবর্তী প্রজন্ম ঋণী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই জানাতে হবে।

পিতৃঋণ ও পিতৃযজ্ঞ—

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য কালি দিয়া
পিতামহদেব কাহিনী লিখেছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

মানুষ ভুঁইফোড় জীব নয়। মানবতা তার প্রয়োজনীয় গুণ। পিতৃ পিতামহ অর্থে নিজ বংশ ধারার ত বটেই, মহৎ গুণ সম্পন্ন মানুষকেও স্মরণ করা তার কর্তব্য। হিন্দুগণ পরলোকে বিশ্বাস করেন। পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন—তাই পিতৃ পিতামহদের তর্পণ করতে গিয়ে আহ্বান করেন—আগচ্ছতু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্নন্তাপোঞ্জলীম। পিতৃপক্ষের বিশেষ দিন-গুলিতে নিজ নিজ বংশধারার মাতৃকুল ও পিতৃকুলের উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ পর্যান্ত স্মরণ করেন। এমন কি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয়দেরও তর্পণ করেন। এই সর্বব্যাপী প্রেমের মানসিকতা লক্ষ্যণীয়।

মনুজ ঋণ ও মনুজ যজ্ঞ—এই যজ্ঞই সমাজ চেতনা তথা অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় অংশ। হিন্দুগণ মনে করতেন পৃথিবীর সব মানুষের নিকটে সব মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী। প্রতিটী মানুষের মধ্যে সেই ঋণ শোধের জন্য মনুজ যজ্ঞের স্পৃহা জাগ্রত থাকলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত হয়। সেই মানসিকতা নিয়েই মনুষ্য তর্পণের মন্ত্রে তাঁরা উচ্চাচরণ করলেন।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃর্মাতা মহাদয়।
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম
ময়া দত্তেন তোয়েণ তৃপ্যন্তু ভুবন ত্রয়ম।

জড়বাদীগণ হয়ত তর্ক করবেন আত্মা বা পুনর্জন্ম সবই ভ্রান্তি কাজেই ঐ সব মন্ত্রোচ্চারণ নিরর্থক। এই তর্কের শেষ নাই। কিন্তু মানসিকতাটা লক্ষ্যণীয় যে বিশ্ব মানবতার সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের জন্য তাঁরা ইচ্ছুক।

সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবীর সবাই তাঁর আত্মীয়। এই বার আলোচনা করা যাক আশে পাশের সব মানুষের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কি বলা হয়েছিল।

ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজধানী পত্তন করেছেন নীতিবিদ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির। ময়দানব নির্মাণ করেছে সুরম্য সভাগৃহ। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। রাজ্যের ব্যবস্থাপনার সৌকর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্নচ্ছলে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। তার মধ্যে প্রজা সাধারণের প্রতি প্রজাপালকগণের ব্যবহার কেমন হবে তার কিছু তুলে ধরা হচ্ছে। দেবর্ষির প্রশ্নে—প্রচুর রাজনীতি সংক্রান্ত উপদেশ আছে—কিন্তু যে উপদেশগুলি সবার পক্ষেই মনুজ যজ্ঞের আওতায় আসে—সেগুলি—বিশেষ ভাগে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ আপনার আয়ের চতুর্থ ভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা আপনার ব্যয় নির্বাহ করেন ত? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক বর্গ আপনার ব্যয় সকল পূর্বাহ্নেই নির্ণয় করে থাকে ত? (Budget estimation)

রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করছে। রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে সলিল পূর্ণ সুবৃহৎ হ্রদ তড়াগ সকল খনন করেছেন ত? কৃষি কার্য্য যাতে বৃষ্টি নিরপেক্ষ থাকে সেজন্য যত্নবান হয়েছেন ত? কৃষকদের গৃহে বীজশস্য এবং অন্নাদির অভাব নাই ত। প্রয়োজনে তাদের ঋণ এবং অনুগ্রহস্বরূপ শত চতুর্থাংশ অর্থ দান করেন ত? (ঋণ যা সুদে পরিশোধ্য এবং অনুগ্রহ দান শতকরা চার ভাগ।) পল্লী গ্রাম সকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষ পল্লী সকল পল্লী গ্রামের ন্যায় সুবিধা সম্পন্ন করে রেখেছেন ত? অন্ধ মূক পঙ্গু বিকলাঙ্গ বন্ধুহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিগণকে পিতার মত প্রতি পালন করেন ত? অতি নিদ্রা আলস্য, ভয় মৃদুতা ক্রোধ ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করেছেন ত? শিল্পকারগণকে ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী নিয়ত জুগিয়ে থাকেন যাতে তারা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী শিল্প দ্রব্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। সর্ববিদ্যা বিষয়ে গুণ বিবেচনা করে ব্রাহ্মণ বিদ্বান ও সজ্জনগণের পূজা করেন ত। যথা কালে গাত্রোত্থান করে বেশভূষা সমাপন করে কালজ্ঞ মন্ত্রিগণের সঙ্গে দর্শনার্থী প্রজাগণকে দর্শন দান ও তাদের নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করেন ত?

এই কথোপকথনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে মানবিক বোধের অনুশাসন তা তিনি রাজাই হোন বা যাই হোন।

এই প্রসঙ্গের পরে আলোচ্য হবে সাধারণ মানুষ কিভাবে মনুজ যজ্ঞ নির্বাহ করবে।

ভাবতবর্ষে চিরকালই অতিথি সেবা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হত। অতিথি ত বটেই নিজের অন্নের ভাগ অন্যের জন্যও দিতে হবে। মহানির্বাহ তন্ত্রে বলা হয়েছে—

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরাণ
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতারপি।

গৃহস্থগণ স্বীয় প্রাণ কণ্ঠাগত হলেও মাতা-পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি ও সহোদর এদের না দিয়ে কিছুতেই ভোজন করবে না।

আর একটী শ্লোকে বলা হয়েছে—

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্য ভ্রাতৃ সুতানপি
জ্ঞাতীন মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়ে ত্তোষয়েদগৃহী।

গৃহস্থগণ এইভাবে ভ্রাতাগণ ভগিনীগণ তাদের সন্তানগণ জ্ঞাতি মিত্র বর্গ ভৃত্যগণ সকলেরই যথাযথ ভরণ পোষণ এবং তুষ্টি বর্দ্ধন করবেন।

ততঃ স্বধর্ম নিরতান এক গ্রাম নিবাসিনঃ
অভ্যাগতানুদাসীনান গৃহস্থং পরিপালিয়েৎ।

এক ধর্মাশ্রিত সমস্ত গ্রামবাসীগণ অভ্যাগতগণ এবং যারা উদাসীন অর্থাৎ সংসার ত্যাগী তাদেরও পরিপালন গৃহস্থের কর্তব্য।

লক্ষ্যণীয় এই যে এই অনুশাসন কিন্তু একের জন্য নয় যে বিতর্ক উঠবে যে এই ব্যবস্থায় পরগাছার মত কিছু অকর্মা লোকের সৃষ্টি হবে। এই অনুশাসন প্রতিটী গৃহস্থের জন্যই, এবং এই ব্যবস্থা একত্রে পালন যারা করেন তাদের স্বধর্ম নিরত বলা হয়েছে। এইভাবে গোটা গ্রাম ও জনপদ এক একটী হিংসা দ্বেষহীন একাত্ম সমাজে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছে। আর একটী অনুশাসনে বলা হয়েছে স্বধর্ম নিরত গ্রামবাসীগণ কখনও কখনও একত্রিত হয়ে গ্রামের হিতার্থে কি করা যায় তার আলোচনা

করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং এই ভাবেই গ্রামের মধ্য সেতু নির্মাণ জলাশয় খনন বৃক্ষাদি রোপণ বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ এই সব করবে। কারণ গৃহস্থের ধর্ম এই।

বলা হয়েছে—

যদ্যেবং নাচরেদ্দেবী গৃহস্থো বিভবে সতি।

পশুবেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোক গর্হিতঃ

যে গৃহস্থ সামর্থ্য বা বিভব থাকা সত্বেও এইভাবে জীবন যাপন করে না সে ঘোর পাপে লিপ্ত পশুতুল্য এবং লোক নিন্দিত হয়। এই অনুশাসন-গুলির মধ্যে সমাজতন্ত্রের যে সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এর চেয়ে যথার্থ সমাজতন্ত্র আর কি হতে পারে। তবে একটা কথাই বলা যায় যে কোনও খানে বলপূর্বক ঘাড়ে না চাপিয়ে ধর্মীয় নৈতিকতার আদর্শের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভক্তির তরণীতে চাপিয়ে ব্যক্তিগত স্খলন পতনের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা হয়েছে।

ঋগ্বেদেও এমন অনুশাসন পাওয়া যায়

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ

সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য

নার্য্যা মনং পুষ্যতি নো সখায়ং

কেধলাঘো ভবতি কেবলাদি।

সে সংকীর্ণ চিত্ত তার ভোগ বস্তু ব্যর্থ। স্বার্থপরের সঞ্চিত বস্তু তারই মৃত্যুকে ডেকে আনে। যে সম্মানিত এবং সুহৃদবর্গকে পোষণ না করে একাকী ভোগ করে সে শুধু পাপকেই অর্জন করে।

যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যতে সর্ব কিল্বিষৈঃ

ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচত্যাত্ম কারণাৎ

(৩/১৩)

যিনি যজ্ঞাবশেষ ভোগ করেন তাঁর সর্ব পাপ মুক্তি ঘটে।

(এখানে যজ্ঞ বলতে কি বোঝা যায় তা আগেই আলোচিত হয়েছে। কাজেই মানুষের পঞ্চ যজ্ঞ রূপ কর্মের পরে যা অবশিষ্ট থাকে— অর্থাৎ

নিজের প্রাপ্য বলে চিহ্নিত হতে পারে গৃহস্থ সেই টুকুই ভোগ করবে। শুধুমাত্র আত্ম সুখের জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করা বা অন্নপাক করা পাপের কাজ।)

গৃহস্থের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু দ্রব্য চিহ্নিত হবে এই প্রশ্নের সমাধানে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন —

যাবদ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।

অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ।

যতটুকু ভোগ্য বস্তুতে উদর পূর্তি অর্থাৎ জীবন ধারণ ও ভরণ পোষণ হয় ততটুকুই মানুষের অধিকার। তার অধিক যে গ্রহণ করতে চায় সে চোর, কাজেই দণ্ডনীয়।

আমরা সাধারণ ভাবে জানি যে না বলে পরের জিনিষ নিলে চুরি করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজ চেতনার অনুশাসনে বলা হচ্ছে যে যেটুকু যার প্রাপ্য বলে শাস্ত্রীয় সদাচার অনুমোদিত নীতিতে উক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশী নিজের জন্য রেখে দিলে তাকেও চোর বলা হবে, সে ধন স্বোপার্জিত হলেও।

মনু বলেছেন—

অঘং সে কেবলং ভুঙ্‌ক্তে

যে পচত্যাত্ম কারণাৎ

সমস্ত যজ্ঞ সমাপণের পরে মানুষের নিজের জন্য যা চিহ্নিত হয় তাকে বিঘস এবং অমৃত বলা হয়।

মনু বলেছেন—

বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃত ভোজনং

বিঘসো ভুক্ত শেষস্তু যজ্ঞ শেষং তথামৃতম।

সমস্ত যজ্ঞ সমাপনান্তে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই গৃহস্থের ভোগ্য। এই ভাবে গৃহস্থ অমৃত ভোজনের অধিকারী হয়। সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্যই এই অনুশাসন। রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবার জন্যই এই অনুশাসনগুলির সৃষ্টি হয়েছিল এই সব মেনে চলবার

জন্যই। অর্থ উপার্জন ভোগ্য দ্রব্য ভোগ ও বন্টনের কথাও এই অংশের রূপকের মধ্য দিয়েই বলা হযেছে। মহাভারতে শান্তি পর্বে বলা হয়েছে—

বিস্তরাঃ ক্লেশ সংযুক্তা সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ
পরার্থং বিস্তরা সর্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ।

ভোগ এবং ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবহারে নিজের জন্য সংকোচ করে অন্যের জন্য বিস্তার করে দিলে সেটাই যথার্থ সুখ।

আর একটী শ্লোকে বলা হয়েছে -

ভৃত্যাতিথিষু যে ভুংক্তে ভুক্তবৎসু সদানর:
অমৃতং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠিরঃ

হে যুধিষ্ঠির যে নর ভৃত্যগণ, অতিথিগণ এবং অন্যান্য পরিজনগণকে ভোজন করিয়ে নিজে অবশিষ্টটুকু ভোজন করেন তিনি অমৃত ভোজন করেন। স্বার্থপর ভোগীর প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করে বলেছেন—

ভক্ষ্যং পেয়মথো লেহ্যং যচ্চান্যৎ স্বাদু ভোজনম
প্রেক্ষমানেষু যোঽশ্নীয়াৎ নৃশংসমিতি তং বদেৎ।

যে অপরকে না দিযে কেবল একাকী স্বাদু আহার্য্য এবং ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করে তাকেই বলা হয় নৃশংস।

মনুজ যজ্ঞের বিশেষত্ব হল পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষকে আত্মীয় বলে জ্ঞান করা। নিজের পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে একত্রে বাস পান ভোজন স্বধর্মাচরণ এবং প্রীতির সম্পর্ক। শুধু নিজের পরিবার নয় গ্রামবাসীগণও একই পরিবারের মানুষ বলে চিন্তা ও আচরণ। প্রতিটী মানুষকে সমাজের কাছে তার জন্মগত ঋণ শোধ করবার অনুশাসনই দেওয়া হয়েছে সেই সংবিধানে বলা হয়েছে—

স্থানুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম। (মনু সংহিতা—৯-৪৪)

যেমন তীর নিক্ষেপ করে যে মৃগবধ করে ঐ নিহত মৃগ তারই প্রাপ্য; জঙ্গল কেটে যারা ভূমিকে কর্ষণের উপযোগী করে ভূমি তাদেরই প্রাপ্য।

(বর্তমান দিনের—লাঙ্গল যার জমি তার কথাটীর সঙ্গে উপমেয়।)

পাশ্চাত্য দেশ সুলভ ব্যবস্থায় যার যার মত পৃথক হয়ে যাওয়া এমন কি বয়ঃ প্রাপ্ত পুত্রের ও পিতা মাতা থেকে পৃথকভাবে বাস করা ভারতীয় অধ্যাত্ম সমাজ চেতনায় চিন্তনীয় ছিল না।

ভুত যজ্ঞ – প্রাত্যহিক পঞ্চ যজ্ঞের শেষ অংশ হল ভুত যজ্ঞ। আমাদের চারপাশে যে প্রাণী জগত আছে—জঙ্গম এবং স্থাবর তার প্রতি ঋণ স্বীকার করে তাদের যথাযথ পালন ও পোষণ। ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনায় মানব ধর্মের সংজ্ঞায় অহিংসা একটী বড় ধর্ম বলে ধরা হয়েছে। একথা সত্য মানুষ বেঁচে থেকে যথাযথ ভাবে কর্তব্য কর্ম করে চললে কিছু কিছু হিংসা এসেই পড়ে তার জীবনে। প্রকৃতির বিধানে এই ঘটনা অনিবার্য্য। বনের বাঘ শিয়াল প্রভৃতিকেও অন্য জন্তুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। মানুষকেও ক্ষেতে ফসল ফলাতে শস্য নষ্টকারী কীটপতঙ্গ ইঁদুর প্রভৃতির বিনাশ সাধন করতেই হয়। আবার খাদ্য হিসাবেও কিছু জীবকে হত্যা করতে হয়। এক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে অহিংসার সংজ্ঞা নির্ণয় সম্ভব নয়। কিছু শিথিল নিয়ম ধরলে অহেতুক হিংসা ত্যাগ বা আমাদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও উপকারী প্রাণীকে রক্ষণ এবং তাদের বধ না করাকে বোঝায়। গৃহপালিত প্রাণী যেমন—গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ তাদের রক্ষা করা খাদ্য দেওয়া সবই ভূত যজ্ঞের অন্তর্ভূক্ত। প্রাণী জগত ও বৃক্ষ জগতের সঙ্গে মৈত্রী ও প্রেমের সম্পর্কই ভারতীয় ধর্ম দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেই নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ—যাঁর জীবনে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব নিগূঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল—তাঁর তপোবন প্রবন্ধে লিখেছেন। বহু কোটী লোক প্রায় সমগ্র জাতি মৎস্য মাংস আহার একেবারে ত্যাগ করেছে পৃথিবীর কোথায় এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ আহার না করে। ভারতবর্ষ এই যে আমিষ ত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনের জন্য নয়। নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্য লাভের জন্য নয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবের প্রতি হিংসা

ত্যাগ করা। এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগ সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার পেট ভরাবার জিনিষ বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারিনে। তবে প্রাণ জিনিষটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যাস্ত হয়ে যায় যে কেবল আহারের জন্য নয় শুধুমাত্র প্রাণী হত্যা করাই আমাদের কর্মের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে। এই যোগ ভ্রষ্টতা, বোধ শক্তির অনড়তা থেকে ভারতবর্ষ, মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে?

ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবনে এই অনুশাসনগুলি মেনে চলবার জন্যই ভারতীয় সংবিধানে (মনু যাজ্ঞবল্ক্য তন্ত্র দর্শন প্রভৃতিতে) গৃহীত হয়েছিল। এবং সমাজে প্রচলিতও হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আচ্ছন্ন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। তবে কালের গতিপথে যুগে যুগে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মূল আদর্শের অনেকখানি বিকৃতি ঘটেছে একথাও সত্য। মোগল পাঠানের রাজত্বকালে দীর্ঘ বৎসরগুলি ধরে তাদের বিলাস বহুল কামনা লালসা পিচ্ছিল জীবন চিন্তা ভারতীয় সমাজ চেতনাকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছে।

আদর্শ ভ্রষ্টতা কি বা আদর্শ অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যা সব সময়েই মানব সমাজে আছে। বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রবাদ যাকে এই মতের পৃষ্ঠ পোষকগণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সঞ্জাত এবং সেই কারণে এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা বলে গর্ববোধ করে এসেছেন তাদেরকেও অনুধাবন করতে বলি—বিভিন্ন দেশে ঐ সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলিকে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব—কাম্পুচিয়ার পল পতের কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বিপুল গণহত্যা, চারু মজুমদারের ব্যক্তি হত্যার পরিকল্পনা সবই কিন্তু বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রবাদের নানা ব্যাখ্যা থেকেই উদ্ভূত।

ভারতের অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য চীন, কাম্পুচিয়া বা নকশালপন্থীদের মত হত্যাকাণ্ডকে

ঔচিত্যের উজ্জ্বল রং দিয়ে সাজাবার মত পৈশাচিক প্রয়াস নাই। এক নৈতিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে—সমস্ত গ্রামবাসী, জনপদবাসী এক এক পরিবারের মত সমবায় সমাজ গড়ে বাস করবার মত প্রেরণা পাই। স্বার্থ-পরের মত পৃথক পৃথকভাবে আত্মসুখ নিয়ে বাস করবার ও অন্যকে বঞ্চিত করে ভোগ করাকে যে অনুশাসন নৃশংস আচরণ বলে নিন্দিত করেছে। সন্দেহ নাই যে মোগল পাঠান রাজত্বকালের সর্বনাশা বিলাসিতার বীজ সমাজে প্রবেশ করে এই সামাজিক প্রথাকে ধ্বংস করেছিল।

দেশব্যাপী হিংসা বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ। বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্যই শোষণ মুক্ত সমাজের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন কিন্তু সেখানে একটা বিশ্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে মানুষের যোগ নাই, নৈতিকতার আদর্শ যেখানে ভোগ সর্বস্ব আত্মা ঈশ্বর সবই চিত্তবিভ্রম—মনোমরীচিকা তাদের মতে—

অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরণীশ্বরম
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম।

জগত সত্যশূন্য মিথ্যা ব্যবহার পূর্ণ ধর্মাধর্মের ফলশূন্য ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রী পুরুষের কামপ্রসূত সৃষ্টি মানুষ এছাড়া কিছুই নয়।

এই চিন্তার পরিণামে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, পল পতের ব্যাপক গণহত্যা ও চারু মজুমদারে নৃশংস পরিকল্পনার মত হঠকারী বিভ্রম আসতেই পারে।

তাই ভারতবর্ষকে আজ ভাবতে হবে তাদের ঐতিহ্যের কথা, তার উত্তরাধিকারের কথা—যে উত্তরাধিকার অবতীর্ণ ভারতের তপোবন থেকে উপনিষদ—তন্ত্রের আলোকে যার পথ আলোকিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্য উপলব্ধির ফলে তপোবন প্রবন্ধে লিখেছেন—ভারতবর্ষ যদি খাঁটী ভারতবর্ষ না হয়ে ওঠে-তবে পরের বাজারে মজুরী গিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি সম্মান বোধ চলে যাবে। এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তস্বরূপে লাভ করতে পারে সে সত্যটা কি। সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্ব মানবিকতা। সে সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে— অদ্বৈততত্ত্ব—ভাবে বিশ্বমৈত্রী—কর্মে যোগ সাধনা।

গ্রন্থ সমাপ্ত